৩৮ বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

সূচিপত্র

মেঘনাদ সাহা স্মরণে	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩
কেরলে বন্যা	তপোব্রত সান্যাল	৭
বখে যাওয়ার একাল সেকাল	অরুণালোক ভট্টাচার্য	৮
মিডিয়ার প্রচার-স্বাধীনতা	শৈবাল কর	১২
ফিবোনিচির রহস্য সংখ্যা	বরুণ দত্ত	১৪
অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী	ইন্দ্রনীল ঠাকুর	১৬
এক শিক্ষিকার মৃত্যু	সুদেষ্ণা বসু	১৮
বাবা রামদেব ও পতঞ্জলী	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	সমীরকুমার ঘোষ	২৪
উন্নয়নের ফাঁসে জলাভূমি	ধ্রুবা দাশগুপ্ত	২৬
অগ্রগতি কি অবশ্যম্ভাবী	ললিত খাঁড়া	২৯
ক্ষুদ্র তবু তুচ্ছ নয়	পূরবী ঘোষ	৩০
পুস্তক পর্যালোচনা	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	৩১
সংগঠন সংবাদ		৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর), কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩০৬৫৯০৫৮ /৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট: utsomanus@gmail.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanus/

কিছু আত্মহত্যা, কিছু প্রশ্ন

দিনকয়েক আগে এক সংবাদপত্রের খবর: 'শহরে ফের একাকী বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার।' গড়ফার শহিদনগরের ঘটনা। ৬৫ বছরের দীপ্তি মৈত্র একাই থাকতেন। স্বামী প্রয়াত কয়েক বছর আগে। দুই পুত্র মুম্বইয়ে কর্মরত। গলায় গামছার ফাঁস দিয়েছিলেন। সুইসাইড নোটে লিখেছেন, কেউ দায়ী নয়। অনুমান, মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

এর সপ্তাহখানেক আগে মানিকতলার আবাসনে প্রায় একই ঘটনা। প্রবাসী পুত্রের চিন্তা এবং স্বামী মৃত্যুর পর একাকীত্বের হতাশায় পেটে গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক বৃদ্ধা। অসুস্থতা ও পুত্রকন্যার থেকে দূরত্বের অবসাদে কয়েক মাস আগে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বেহালার এক প্রৌঢ় দম্পতি। কেউ বলতেই পারেন, এমন তো কতই হয়! কে কোথায় একাকীত্বে ভুগছে, আত্মহত্যা করছে, তা নিয়ে আমার-আপনার অত ভাবলে চলবে! আমার-আপনার হয়ত এই মুহূর্তে কিছুই নয়। কিন্তু আগামী দিনে আমাদের যদি এমন পরিণতিই হয়! সময় তো সেদিকেই এগোচ্ছে। সল্টলেকের কথাই ধরুন। গোটা সল্টলেক বৃদ্ধাশ্রম হয়ে উঠেছে। সব বাড়িতেই বুড়ো ও বুড়ি বা দুজনের একজন। বিকেলে বারান্দায় তাঁদের বিমর্ষ মুখে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র বা কাছাকাছি অন্য কোনো প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান হলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওঁরা ভিড় করেন। ওঁদের সন্তানরা সব মহা মহা কৃতী। বিদেশে, নিদেন

১০ম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

বক্তা: নদীবিশেষজ্ঞ তপোব্রত সান্যাল

বিষয়: বছর বছর বন্যা— এই বিপর্যয় কি আদৌ ঠেকানো যাবে?

১৭ নভেম্বর, শনিবার, বিকেল ৫-৩০

বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের সেমিনার কক্ষে।

ভিন রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিয়ে করে সেখানেই ঘোর সংসারী। বাবা-মাকে কে দেখবে, এই প্রশ্নে কোনো ছেলেমেয়ে নিজের কেরিয়ার বিসর্জন দেবে, এ যুগে এমন বোকার হদ্দ আর কেউ নেই। বেশি টাকা, বেশি সুখ, বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নির্দ্বিধায় বাবা-মাকে বিসর্জন দেওয়া যায়। এ হল যুগনীতি। এর জন্য কি সন্তানদের দোষ দেওয়া যায়? সম্ভবত না। আমরা তো নিজেরাই ওদের ওভাবে ভাবতে শিখিয়েছি, শেখাচ্ছি। অতএব...।

'অগ্নীশ্বর' ছবিতে শেষের দিকে ছেলে মাকে ডুলিতে চাপিয়ে তীর্থে নিয়ে যাচ্ছে। পথে ডাক্তার অগ্নীশ্বরের সঙ্গে ওদের দেখা, এমন একটি দৃশ্য আছে। ছেলেটি সৎছেলে। তবু কেন মাকে আঁকড়ে, তার কারণ ছবির প্রথম দিকেই আছে। আমরা এগুলোকে মান্ধাতার আমলের ছেঁদো আবেগী ভাবনা বলে উড়িয়ে দিতেই পারি। সেটাই বোধহয় নিরাপদ! নইলে আধুনিকতা কিসের!

ঈশ্বরীকে দেবী অন্নপূর্ণা মুক্তি, মোক্ষ, চির স্বর্গবাস, রাজ্য, ধনরত্ন— অনেক কিছু দিতে চেয়েছিলেন। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' নেয়ের ছিল এটুকুই কামনা। মা-বাবার কামনা ছিল সামান্য, ছেলেমেয়েরাও তাই সামান্যে তুষ্ট হত। এখন আমাদের কামনা আকাশছোঁয়া। তা সংক্রামিত করছি সন্তানদের ওপর। ফল যা হওয়ার তাই।

আপাতত সমকাম, পরকীয়া, কোন মন্দির মেয়েদের ঢুকতে দিচ্ছে, না দিচ্ছে না ইত্যাদি অতি-জরুরি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাই। কটা বুড়োবুড়ি আত্মহত্যা করছে করুক!

● পরাধীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার জন্য ১৮৭৬ সালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যাদবপুরে গড়ে তুলেছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অভ সায়েন্স। সম্প্রতি তার দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হল। সুখবর। উদ্বোধনের দিন হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল গণেশ চতুর্থীকে। এসেছিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মন্ত্রী হর্ষবর্ধন। তিনি অনুষ্ঠানটিকে শুভময়তায় মাখামাখি করে ফেলতে নারকোল ফাটিয়ে উদ্বোধন করলেন। ব্যাপারটা যে ওখানকার কর্তাব্যক্তিদের হর্ষ বর্ধন করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। তাঁরা কোনো প্রতিবাদ করেননি। ভালই করেছেন, করে কে রাজরোষে পড়তে চায়! শুধু বিজ্ঞান ভারতীয়দের পেটে হজম হয় না। একটু ধর্ম মিশিয়ে ককটেল না বানালে কি তোফা মৌতাত জমে!

● দেশ ও দশের কথা থাক। আসা যাক পত্রিকার কথায়। 'অ্যান্টিবায়োটিক' আশীর্বাদ থেকে ক্রমশ অভিশাপ হয়ে উঠছে। প্রকৃতি সবাইকে বেঁচে থাকার অধিকার দেয়, প্রতিকূলতাকে জয় করার শক্তি জোগায়, ধ্বংস করার যখন নিজেই করে। আমরা এটা ভুলে যাই। বিজ্ঞানের বেহিসেবি ব্যবহার করে অনেককে ধ্বংস করার খেলায় মেতে উঠি। আপাতভাবে লাভ হলেও, পরে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফল ভুগতে হয়। যা অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রেও ঘটছে। জীবাণুরা নিজেদের বদলে নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে আরও মারাত্মক হয়ে উঠছে। অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারে আমরা সে পথই সুগম করে দিচ্ছি। এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, ২০০০ সালে যে পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হত, ২০১৫-য় তা বেড়ে গিয়েছে ৬৫ গুণ! এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। চীন ও পাকিস্তানও কম যাচ্ছে না। প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করা জীবাণুরা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। কেন, কীভাবে তা নিয়ে ইন্দ্রনীল ঠাকুরের লেখাটি সবিস্তার আলোচনা করেছে।

বন্যা হলেই তা 'ম্যান মেড' কিনা তা নিয়ে প্রায়ই তর্ক ওঠে। কেরলের বন্যা নিয়েও উঠল। বেআইনি পাথর খোদাই, অবাধ বৃক্ষনিধন, ঘাসজমির অপচয়, ঘনঘন নিকাশি ব্যবস্থার পরিবর্তন, নদীতটের বালি তোলা— ভয়াল বন্যার মূলে এগুলোই। বলছেন, ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ সায়েন্সের শাখা সংগঠন সেন্টার ফর ইকোলজিক্যাল সায়েন্স-এর পরিবেশবিদ মাধব গাডগিল। নির্বিচারে পাথর খোদাইয়ে ধ্বংস হচ্ছে বনভূমি। ধস নামছে। বানভাসি কেরলের অধিকাংশ মৃত্যুর কারণই ধস। পুনের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজির পরিবেশবিজ্ঞানী রক্সি ম্যাথিউ কোলের বক্তব্য, অতিবৃষ্টিতে মাটি অতিরিক্ত জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা হারালে তা ঝরনা, নদীবাঁধ ছাপিয়ে ধস, হড়কা বান ডেকে আনে। ক্যাগের রিপোর্ট দায়ী করেছে ত্রুটিপূর্ণ নদীবাঁধ ব্যবস্থাপনাকে। পত্রিকার পাতায় কেরল-বন্যার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন তপোব্রত সান্যাল।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর ২০০৯ সাল থেকে আমরা আয়োজন করছি স্মারক বক্তৃতার। ইতিমধ্যে গুণী, কৃতবিদ্যরা নানা বিষয়ে আলোচনা করে আমাদের আলোকিত করেছেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এবার স্মারক বক্তৃতা দশম বর্ষে। ১৭ নভেম্বর, শনিবার, বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের সেমিনারকক্ষে। বক্তা নদীবিশেষজ্ঞ তপোব্রত সান্যাল। বিষয় 'বছর বছর বন্যা— এই বিপর্যয় কি আদৌ ঠেকানো যাবে?' প্ল্যানেটেরিয়াম কর্তৃপক্ষ গতবার আমাদের অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করেছিলেন, আমরা ঋণী। এবারেও ওঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ওই দিনই প্রকাশিত হবে উৎস মানুষ সঙ্কলন 'বাঁধ বন্যা বিপর্যয়' বইটি। আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ রইল।

তারপর আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে জানুয়ারিতে, বইমেলায়। 'যুক্তিবাদের চার সেনাপতি' বইটি নিঃশেষিত অনেকদিন। আরও কয়েকটি লেখা জুড়ে ওটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে চলেছে। প্রকাশ-ইচ্ছা রয়েছে আরও দু-একটি বইয়ের।

উমা

আহরণ

মেঘনাদ সাহা স্মরণে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আচার্য মেঘনাদ সাহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ যেখানে আলোচনার আয়োজন হয়েছে, স্থান-মাহাত্ম্য আছে সেই জায়গার— তাঁর বহু স্মৃতিবিজড়িত এই বক্তৃতাকক্ষ। এখানে বসে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি; তাঁর গুণাঙ্কিত যে চরিত্র, তাঁর দীপ্তিমান যে কীর্তি, তাকে স্মরণ করছি। তিনি চলে যাবার পর আমাদের জীবনে যে শূন্যতা এসেছিল, সে শূন্যতা আজও পূরণ হয় নি। সেই শূন্যতার কথা স্মরণ করে আমরা সকলেই যেন আবার মেঘনাদ সাহার অনুপস্থিতির যে বেদনা, তা অনুভব করছি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, তবে নানা সুবাদে ডঃ সাহার জীবনের শেষ দিকে— অন্তত ১৫-১৬ বছর বা আরো কিছু বেশি, তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগাযোগের সুযোগ আমার হয়েছিল এবং সেজন্যেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকার হয়তো বা আমি অর্জন করেছি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন, তা নিয়ে বহু আলোচনা হতে পারে, তবে আমি আলোচনা করব প্রধানত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

আমার মনে পড়ে আমার ছেলেবেলাকার কথা, যখন আমরা গর্ব করতাম ডঃ সাহার মতন ব্যক্তিকে নিয়ে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীনতার পরে জন্মেছেন, তাঁরা পরাধীনতার গ্লানির কথা বুঝবেন না। পরাধীনতার যে বেদনা, পরাধীন দেশবাসী হয়ে থাকবার যে যন্ত্রণা, তাকে শুধু বিড়ম্বনা বললে মানায় না, অসম্ভব সেই কষ্ট। এই যে মর্যাদাহীন অবমাননা— যাঁরা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, যাঁরা প্রাক্-স্বাধীনতার অনুভূতি স্মরণ করতে পারেন, তাঁদের মনে পড়বে সেই অনুভূতির কথা। যাঁদের স্মরণে নেই সেই কথা, তাঁরা জানবেন না পরাধীনতার বেদনা। তাঁরা বুঝবেন না যে, যতই অপূর্ণ হোক এই স্বাধীনতা আমাদের কাছে, যতই বিপন্ন হোক না কেন— বিশেষ করে আজকের দিনে— ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব এবং তার স্বাধীনতা, তবুও ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে, দেশ বিভাগের দণ্ড দিয়ে, মূল্য দিয়ে আমরা দেশকে নিয়েছিলাম ইংরেজদের হাত থেকে; 'Transfer of Power' বা 'ক্ষমতা হস্তান্তর', এই কথা তারা ব্যবহার করেছিল। এই স্বাধীনতার ভিতর যত কিছু গলদ, যত কিছু অভাব থাকুক না কেন, তবুও অন্তত আমরা স্বাধীন। অন্তত কতকগুলো দিক থেকে— রাজনৈতিক দিক থেকে, নানান অনুষ্ঠানের দিক থেকে— আমরা সমস্ত জগৎ জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। পরাধীনতার যে বেদনা, সেই বেদনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা থেকে আমরা রেহাই পেয়েছি।

কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় তো এরকম ছিল না। তখন আমরা সেই সব প্রখ্যাত লোকেদের কথা ভাবতাম, ভেবে গর্ববোধ করতাম, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে পরাধীন ভারতবর্ষের মান তুলে ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ— যশস্বী লোকের সংখ্যা তো নিতান্ত কম ছিল না। আজকের দিনে আমাদের মধ্যে এরকম দু-একটি মহৎ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাজের বিচার নানা ভাবে হতে পারে, তাঁর সম্পর্কে সমালোচনাও অনেক হতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার প্রবর্তন করে তিনি ভারতবর্ষের মর্যাদা অনেকাংশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর আমলে জগতের গবেষণার মানচিত্রে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আচার্য মেঘনাদ সাহা।

সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে মেঘনাদ সাহার যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, তার পিছনে ছিল তাঁর দেশাভিমান,দেশ সম্পর্কে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ। একটা ইডিয়ম (idiom) খুব চালু ছিল তখনকার দিনের ভাষায়— 'স্বদেশী করা'। বিদ্যার্জনের মধ্যে নিমগ্ন থেকেও মেঘনাদ সাহা স্বদেশী করতেন, সত্যেন বসু স্বদেশী করতেন। তাঁদের অল্প বয়সে স্বদেশী আন্দোলনের দু-একটা পর্যায় ছিল, সেই সব পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় যাঁরা নেমেছেন, সে সব মানুষের কারো কারো সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ছিল। গবেষণায় রত অবস্থাতেও এঁদের মধ্যে ছিল দেশাভিমান। সত্যেন বসু বিশ্ববিশ্রুত আইনস্টাইনের সঙ্গে পত্রালাপ করছেন,

তখনো তিনি সত্যেন বসু, এম.এস.সি., কলকাতা— ডিগ্রির জন্যে কোনো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ধর্না দিতে যান নি। মেঘনাদ সাহাও ডি.এস.সি., কলকাতা— প্রি-ডক্টরেট ফেলোশিপ হয়তো অনেক জায়গায় পেতে পারতেন কিন্তু ডিগ্রির জন্যে কোথাও যান নি। এঁরা স্বদেশী করতেন নিজস্ব ধরনে। তখন আমাদের পরাধীন দেশের মানুষ প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে রয়েছে— সেই সব মানুষকে আপনজন ভাবতেন বলেই স্বদেশী করতেন।

এঁরা ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র— তাঁর কথা বলতে গেলে তো মহাভারত লিখতে হয়। দেশের জন্যে তাঁর কত চিন্তা— দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা ভাল করে তোলা, নতুন জীবন এনে দেওয়া, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার বন্ধ করা, বাঙ্গালীকে নতুন করে গড়ে তোলা। 'রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ করো নি'— রবীন্দ্রনাথের এই যে খেদ, সেই খেদকে দূর করবার চেষ্টায় নেমেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর মন্ত্রশিষ্য হিসেবে যে ক'জন এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা।

আমার মনে পড়ছে, প্রথম যখন আমি তাঁকে দেখি, তখন আমার বয়স বেশি নয়— ১৫/১৬ বছরও হয়নি তখন। আমি আমার পিতামহের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই 'দৈনিক বসুমতীর' দপ্তরে যেতাম। ঐ দপ্তর তখন ছিল, এখনো আছে, ১৬৬ নং বৌবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট)। আমার পিতামহ তাঁর প্রজন্মের প্রধান সাংবাদিকদের মধ্যে একজন ছিলেন। একদিন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বসুমতীর দপ্তরে একজনকে নিয়ে এলেন, পরিচয় দিলেন বসুমতীর সম্পাদক ও সাংবাদিকদের কাছে: 'এই দেখ, 'here is a greater man than Dr. Ray', এই কথা বলেছিলেন আমার এখনো মনে আছে। ইংরেজিতে যাকে বলে cynical, সাংবাদিকরা সাধারণত সেইরকম একটু হয়ে থাকেন। যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের সম্বন্ধে সাংবাদিকদের এত খোঁজ-খবর রাখতে হয় যে, তাঁরা কারুর সম্পর্কেই খুব একটা উচ্চ ধারণা রাখেন না বা রাখতে পারেন না। যে ডঃ রায়কে সাংবাদিকরা শুধু আচার্যদেব বলে খাতির করতেন, তাঁর কথাতেও তাঁরা পরে একটু হাসি-ঠাট্টা করলেন: 'শুনলেন, উনি বললেন যে, here is some one who is greater than Dr. Ray, অর্থাৎ Dr. Ray নিজেও great man, he is greater than Dr. Ray.' সাংবাদিকরা যে ঠাট্টাই করুন, ডঃ রায় তো 'great man' বটেই। আমাদের মাপকাঠি অনুযায়ী মেঘনাদ সাহাও একজন 'great man' একজন বড় মাপের মানুষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁরা কিজন্যে বসুমতীর দপ্তরে এসেছিলেন?— উত্তর বাংলায় প্রচণ্ড বন্যা হচ্ছে, আর্ত মানুষদের জন্যে তৈরি হয়েছে 'সংকট ত্রাণ সমিতি', সেই সমিতির কাজে। এই সমিতির সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু তখন যুবক— 'নেতাজী' হবার তাঁর তখনো সময় আসে নি—

তিনিও ঐ সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মেঘনাদ সাহাও যোগ দিয়েছিলেন এই সমিতির কাজে। দেশের সেবাকে জীবনের অঙ্গীভূত করবার তাঁর যে বাসনা, পরবর্তী কালে আমরা নানা ভাবে তার পরিচয় পেয়েছি।

চল্লিশের দশকে ভয়াবহ পরিস্থিতি ঘটেছে, দেশে দুর্দৈব চলেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হয়েছে, ফ্যাসিজিমের অগ্রগতি অব্যাহত, চীন বিদ্ধস্ত হয়ে গেছে ফ্যাসিস্ট জাপানের আক্রমণে। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৪১ সালে জীবনান্তের ঠিক পূর্বে 'সভ্যতার সংকট' বলে ঘোষণা জানাচ্ছেন, সেই রকম সময় থেকেই মাঝে মাঝে আমাদের রাজনৈতিক কাজের একটা অনুসঙ্গ হিসাবে ডঃ সাহার কাছে যেতে হত। হয়তো তাঁর আশীর্বাদ চাই কোনো একটা প্রচেষ্টায়, হয়তো তাঁর স্বাক্ষর চাই কোনো একটা আবেদনে, হয়তো তাঁর উপস্থিতি চাই কোনো একটা সভায়— এই সব কারণে তাঁর কাছে আমাদের যাতায়াত এই সায়েন্স কলেজে। সেই যোগাযোগে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হত। আমরা তখন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির পত্রিকার ব্যাপারে অগ্রণী হবার চেষ্টা করছি বলে নানা দিক থেকে বহুজনকে জানবার চেষ্টা করেছিলাম, এঁদের মধ্যে আচার্য মেঘনাদ সাহা ছিলেন একটি বিশিষ্ট স্তম্ভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯৪৫ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে গেছেন, ফিরে এসে ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে (বর্তমানে লেনিন সরণি) সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিতে বক্তৃতা করেছেন। তাতে নোট নিয়ে আমি তার রিপোর্ট ছাপিয়েছিলাম আমাদের কাগজে। আজ তার কোন হদিস পাই না, আমাদের কাগজপত্র পুলিশী অত্যাচারে এবং আমাদের অবহেলায় ও নানা কারণে হারিয়ে গেছে— আমাদের দেশে প্রায় কোনো কিছুই ভালভাবে রাখা হয় না বলে হারিয়ে যায়। ডঃ সাহা সব বিষয়ে যে আমাদের সঙ্গে একমত ছিলেন, তা নয়; কম্যুনিস্ট পার্টি বা আর.এস.পি.-এর সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে তাঁর মতের মিল ছিল না। কিন্তু আমরা যে শোষণহীন অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছি, সেই চেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল অজস্র জিজ্ঞাসা, সর্ববিধ উপায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করবার অদম্য ইচ্ছা। সোভিয়েত ইউনিয়নকে গড়বার জন্যে তখন প্রচণ্ড উন্মাদনা চলেছে, তা নিয়ে স্বভাবতই তাঁর আগ্রহ হয়েছিল। প্ল্যান, পরিকল্পনা, যোজনা, যাই বলি না কেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে যে সব ধারণার প্রবর্তন হচ্ছিল, ডঃ সাহা সেগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, এই যে তিনজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর

জন্মশতবার্ষিকী খুব কাছাকাছি সময়ে পালিত হচ্ছে, আমাদের দেশে পরিকল্পনার শুরুতেই এঁরা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু যখন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করলেন, জওহরলাল নেহেরু হলেন তার সভাপতি। সেই কমিটির একজন মুখ্য সদস্য হলেন মেঘনাদ সাহা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরিকল্পনার কাজে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। যখন দিল্লীতে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়, তখন আমি কলকাতায়। তাঁর মৃতদেহ আনবার জন্যে যাঁরা গিয়েছিলেন, আমি তাঁদের মধ্যে ছিলাম। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়? জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের কাজে, পরিকল্পনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি-ভবনে যাবার পাথরের একটা উঁচু রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়ে যখন তিনি যাচ্ছেন, হঠাৎ একটা স্ট্রোক বা ঐ ধরনের কিছু হয়েছিল। তখন যোজনা-ভবন তৈরি হয় নি, এত হাজার-হাজার কোটি টাকা খরচ করে সব কিছু এত ফলাও করে দেখানো হত না। তখন রাষ্ট্রপতি-ভবনের মধ্যে একটা আউট-হাউসের একটি ঘরে পরিকল্পনা কমিশনের অফিস ছিল। ডঃ সাহা যাচ্ছিলেন সেই অফিসে সময় মতো পৌঁছতে।

পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে ১৯৩৮ সালে সুভাষবাবু যখন কংগ্রেসের সভাপতি, তখন তাঁকে নিয়ে একটা সভা হয়েছিল, বোধহয় আশুতোষ হল বা ঐ রকম কোনো একটা জায়গায়। জাতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুভাষবাবু সেখানে বললেন। ডঃ মেঘনাদ সাহা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমাদের মতন অনুন্নত দেশে সাধারণ মানুষের জীবনের মানকে যথাযোগ্য ভাবে উন্নত করতে হলে কেমন ভাবে এগোতে হবে বলে আপনি মনে করেন।'তখন সুভাষবাবু বলেছিলেন, 'আমাদের মতন দেশে যেখানে দুর্দশায় আকীর্ণ মানুষ মৃতপ্রায় হয়ে কর্ম করছে, সেখানে এগোতে হলে there has to be forced march, তা আমরা যতই গণতন্ত্রের কথা বলি না কেন।' বুর্জোয়া গণতন্ত্র, অত্যন্ত দামী জিনিষ, কোন সন্দেহ নেই, তবে তার পরেও অনেক ভাল জিনিস হয়। তাছাড়া বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে জয় করে আনবার জন্যে জনসাধারণের সংগ্রাম করতে হয়েছে কত শত বছর ধরে, সেটা ভুলে যাওয়া যায় না কিছুতেই। আবার বুর্জোয়া গণতন্ত্র যদি শুধুই নিছক বুর্জোয়া গণতন্ত্র হয়ে থাকে, তবে তার সীমাবদ্ধতা তো কিছুতেই অতিক্রান্ত হবার নয়। সেজন্যেই সুভাষবাবু বলেছিলেন যে, আমাদের মতন দেশে— যেখানে কোটি কোটি মানুষ অভাব এবং বুভুক্ষার মধ্যে চরম দুর্দশায় বাস করছে, যেখানে স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হবার উপায় নেই, সেখানে জোর করে এগিয়ে যেতে হবে, এজন্যেই forced march-এর কথা। মনে পড়ে লেনিনের কথা: 'There is nothing more authoritarian than revolution' যদি বিপ্লব হয়, তাহলে বিপ্লবকে কর্তৃত্ব দিতে হবে। কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে হবে। কর্তৃত্ব ব্যবহারে যদি কোন বিষাক্ত ফল হয়, তবে সেটা অন্যায় হবে। কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে গিয়ে যদি অত্যাচার হয়, অন্যায় হয়, তবে তার প্রতিফল পরে পেতে হবে। কিন্তু কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে হবে, কিছু পরিমাণে শৃঙ্খলা রাখতেই হবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক শৃঙ্খলা, সবাই মিলে একসঙ্গে এক ছন্দে কাজ করা— এইভাবে যে forced march, এ বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে সুভাষবাবুর মতের মিল ছিল। যাঁরা কম্যুনিষ্ট বা কম্যুনিষ্টদের কাছাকাছি এ সব চিন্তা করেন, তাঁদের সঙ্গে ডঃ মেঘনাদ সাহার চিন্তার মিল ছিল। এ কারণেই লোকসভায় তাঁর সঙ্গে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে নেমেছিলাম। কতকাল তাঁর সঙ্গে একত্র কাজ করেছি। উনি আমাদের কথা শুনতেন, আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সবাই শুনবে।'ওঁর মত লোকের কাছ থেকে সেই কথা কত ভাল লেগেছিল—- আমি তো ওঁর ছাত্র নই, কিছুই নই, ওঁর তুলনায় প্রায় কিছুই জানি না, তবু আমাকে বলেছিলেন ঐ কথা। তিনি যে বিষয়ে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী, সে বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তবু তিনি আমাদের স্নেহ করতেন, আমাদের সম্পর্কে তাঁর প্রীতি ও উৎসাহ ছিল কারণ তিনি জানতেন আমাদের সকলকে একসঙ্গে এগোতে হবে। যেহেতু তিনি আর.এস.পি-র সমর্থনে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেজন্য রাষ্ট্রপতি পদের জন্যে বামপন্থীদের প্রার্থী অধ্যাপক কে টি শাহ-এর নাম প্রস্তাব করলেন, সকলে সমর্থন করলাম। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম প্রস্তাবিত হল এবং তিনিই ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। লোকসভায় একটা ঘটনার কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে। জওহরলাল নেহেরু ডঃ সাহা সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করেছিলেন, বলেছিলেন যে, বিজ্ঞান ছেড়ে তিনি এখন রাজনীতির বাজে আলোচনায় জড়িয়ে পড়ছেন। নেহেরু মোটের ওপর সভ্য ব্যক্তি ছিলেন, সৌজন্য থেকে সহজে বিচ্যুত হতেন না, বোধহয় ডঃ সাহার মতন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর বিপক্ষে কথা বলায় খুব বেশি বিরক্ত হয়ে ঐ মন্তব্য করেছিলেন। তবে তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, তাঁর ঐরকম মন্তব্য করা উচিত হয় নি। যা হোক, ডঃ সাহা উত্তরে বলেছিলেন যে, অনেক রাজনীতিবিদদের কথাই লোকে মনে রাখবে না কিন্তু মেঘনাদ সাহার মতন বিজ্ঞানীর কথা পৃথিবীর অনেক লোকেই মনে রাখবে। গর্ব করে তিনি এ কথা বলতে পেরেছিলেন কারণ এ কথা বলবার ক্ষমতা ও অধিকার তাঁর ছিল। করিৎকর্মা লোকেদের প্রতি ডঃ সাহার বেশ একটু সমীহ ছিল। স্ট্যালিনকে উনি খুব সমীহ করতেন। ভারতকে দেওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আলোচনা হলে উনি আমাদের বলতেন, 'আমি জানি এ প্রতিশ্রুতি ওরা রাখবেই কারণ স্ট্যালিনের নিশ্চয় হুকুম হয়েছে যে, ভারতের সঙ্গে ওদের সদ্ভাব এখন দরকার।' ডঃ সাহা নিজেও সক্রিয় ছিলেন, কত

কর্মসূচি রচনা করেছেন। তখনকার দিনে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি থেকে যে সব রিপোর্ট বেরিয়েছে, এম এন রায়ের পক্ষ থেকে 'People's Planning' নামে যে সব রিপোর্ট বেরিয়েছে, সেগুলিতে বহু রকম কর্মধারার কথা আলোচিত হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই প্রায় রূপায়িত হয় নি।

ডঃ সাহা নদীর বিষয়ে, জলের বিষয়ে কত পরিকল্পনা করেছিলেন, সে সব তো আজ আলোচিত হল। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো অনুন্নত বলে চিহ্নিত এমন অনেক জায়গা আছে— যেমন বিহারে চম্পারণ, পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া— যেখানে পানীয় জল পর্যন্ত ঠিক মতন পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকটের' কথা মনে পড়ে। তিনি এরকম বলেছিলেন 'ইংরেজ শাসকদের কোন রকম সার্টিফিকেট দেবার প্রবৃত্তি আমার নেই কারণ ইংরেজ শাসন ২০০ বছরে কি করেছে, তা আমি জানি। একসময়ে আমি ইংরেজদের অনুরাগী ছিলাম, এখনো পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগত ভাবে বহু ইংরেজকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করি কিন্তু ইংরেজদের উপর সাধারণভাবে আমার সমস্ত শ্রদ্ধা-ভরসা চলে গেছে কারণ ২০০ বছরে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে আমাদের দেশকে যে জায়গায় তারা টেনে এনেছে, তা আমি ক্ষমা করতে পারি না।' আমাদের দেশে এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে মায়েদের প্রায়-অখাদ্য তুলে দিতে হয় ছেলেমেয়েদের মুখে, পানীয় জল বয়ে আনতে হয় বহু দূর থেকে। ক'বছর আগে যখন রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী হল, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সভা ডাকলেন কর্মসূচি স্থির করবার জন্যে। আরো কত সভা-সমিতি হল, আমাকেও সেখানে যেতে হয়েছে। আমি বলেছি, জল সরবরাহের জন্যে একটা নির্দিষ্ট টার্গেট নিতে হবে। হাজারটা টার্গেট নিলে কোনটাই হবে না। এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো কাজ হল না। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর সভা হল, জগজীবন রাম মন্ত্রী হিসেবে বললেন, অনেক গ্রামে এখনো পায়খানার ব্যবস্থা নেই, মাথায় করে মল বয়ে নিয়ে যেতে হয়, এটা বন্ধ করতে হবে। কিছু কিছু চেষ্টা হল কিন্তু সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নি। কলকাতাতেও তো কত সমস্যা— সে সবের কি তেমন সমাধান হচ্ছে? আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গর্ব করি, সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু আমরা বেশির ভাগই কর্মবিমুখ, কাজ করতে চাই না। আচার্য মেঘনাদ সাহার দৃষ্টান্ত থেকে তাহলে আমরা কী শিক্ষা পেলাম?

ডঃ সাহা যে পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে ছাত্রদের প্রতি তাঁর দরদের কথা বলতে পারি। তাঁর এক সময়ের ছাত্র, রক্ষণ মন্ত্রকের মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, ডঃ ডি এস কোঠারিকে তিনি নিজে আমার বাড়িতে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'এ আমার সবচেয়ে ভাল ছাত্র'। কোঠারির সঙ্গে পরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয়েছিল। ডঃ সাহা সম্বন্ধে আলোচনা হলে কোঠারি হাত তুলে নমস্কার করতেন, নিজেকে উজাড় করে বলতেন তাঁর কথা। ডঃ সাহা যে কতখানি ছাত্রবৎসল ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে তা জেনেছিলাম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে দেখেছি, তাঁর হাতের চাপড় খেয়েছি পিঠে, কিন্তু তাঁকে তত ভাল করে জানতাম না। তবে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি— প্রকৃত ছাত্র-দরদী বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। মেঘনাদ সাহা হয়তো ততটা ছিলেন না, কিন্তু কোঠারির সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক দেখেছি, তাতে তাঁকেও নিঃসংশয়ে যথেষ্ট ছাত্রবৎসল বলা চলে।

মেঘনাদ সাহা পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন বলে, দেশের মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ছিল বলে তিনি দেশে বিজ্ঞানমনস্কতা আনতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি করা চ্যালেঞ্জের কাজ; এটা ঘরের কাজ নয়, অফিসের কাজ নয়, পারমাণবিক বিজ্ঞানের কাজ নয়, উচ্চতর গণিতের কাজ নয়, এর সঙ্গে সব কাজ জড়িত— এটা তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন কিন্তু এতে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিজ্ঞানের সাধনা, জ্ঞানের পিপাসা, জানবার ইচ্ছা— এ সব তিনি ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। যত জানব, তত বুঝব। জানলে হেতু জানতে পারব, কার্যকারণ সম্পর্ক জানতে পারব। বিজ্ঞান আপনা আপনি আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন নানারকম বুজরুকি, নানারকম ভাঁওতা— যা এখনো আমাদের দেশে প্রচণ্ড মাত্রায় রয়েছে— সে সব আর চলবে না। সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর তরফ থেকে যুক্তভাবে আচার্য সাহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছে, আরো হয়তো কিছু হবে কিন্তু সমস্ত দেশ জুড়ে তো এটা সাড়ম্বরে পালিত হওয়া উচিত। আজকাল মানুষের মন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, মানুষের হৃদয় বলে বস্তু যেন নেই, মানুষের কলজেটা কোথায়, তার কোনো ঠিকানা নেই। এরকম একটা ভয়ঙ্কর রাহুর গ্রাসের মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের সভ্যতা। ১৯৪১ সালে 'সভ্যতার সংকটে' রবীন্দ্রনাথ এই রাহুগ্রস্ত সভ্যতার কথা বলেছিলেন, সেই রাহুর গ্রাস থেকে সভ্যতার এখনো মুক্তি হয় নি।

মেঘনাদ সাহাকে স্মরণ করবার জন্যে আপনারা যে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। তাঁকে স্মরণ করলে কৃতার্থ আমরা কিছু পরিমাণে হব, তবে স্মরণ করে তাঁকে যদি আমরা অন্তত কিছু পরিমাণে অনুসরণ করবার চেষ্টা করি, তাহলেই এই ধরনের অনুষ্ঠান সত্যিকারের সার্থক হবে।

[ঋণ স্বীকার— সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স]

উমা

কেরলে বন্যা: অপরিকল্পিত উন্নয়নও অন্যতম কারণ

তপোব্রত সান্যাল

কেরলের সাম্প্রতিক বন্যা প্রাবল্যের নিরিখে দেশে ও বিদেশে সচেতন মানুষের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। গত একশো বছরে এমন বিধ্বংসী বন্যা ঐ রাজ্যে আর হয় নি। প্রায় ৫০০ জনের প্রাণহানি হয়েছে, বিপুল ক্ষতি হয়েছে সম্পদ ও পরিকাঠামোর।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, অল্প সময়ে প্রচুর ধারাপাতই এই বন্যার উৎস। অতিবর্ষণ-জনিত জলধারা দ্রুত বেরিয়ে যেতে না পারার দরুন এই প্লাবন। মেঘভাঙা (ক্লাউড বার্স্ট) বর্ষায় সব নদীর কূল ছাপিয়ে রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় জল দাঁড়িয়ে যায়। কেরলে নদীর সংখ্যা ৪৪টি। এর মধ্যে ৪১টি নদীর উৎপত্তি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে। সব কটি নদীই পশ্চিমবাহিনী। বাকি তিনটি বইছে পূর্ব দিকে, তামিলনাডুর মধ্য দিয়ে। পশ্চিমবাহিনী নদীগুলি পড়েছে আরব সাগরে এবং একটি মস্ত মরা নদীর সোঁতায় (ব্যাক ওয়াটার)। নদীগুলির কোনোটাই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও প্রবাহের বার্ষিক পরিমাণের বিচারে বড় নয়। তবে সব নদীই খরস্রোতা। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মাটি ধসপ্রবণ। অথচ এই অঞ্চলেই নির্মিত হয়েছে আবাসন ও বিশ্রামাগার। তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এর ফলে চারপাশের পারিবেশিক ও ভৌম সুস্থিতি বিঘ্নিত হয়েছে, সঙ্কুচিত হয়েছে ধারাপতনকে মাঝপথে আটকানোর (ইন্টারসেপশন) ক্ষমতাও। ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদনও এর একটা কারণ। জমির ঢাল বেশি থাকার ফলে বর্ষার মাটি ধোওয়া জল মাটির ভেতরে ঢুকে যাওয়ার আর (ইনফিলট্রেশন) সুযোগ পায় না। তার ওপর জনবাহুল্যের চাপ তো আছেই। যার দরুন অবৈধ নির্মাণ বেড়ে চলেছে।

এখন দেখা যাক, কেমন ছিল কেরলে অতিবর্ষণের মাত্রা

জুন ১ থেকে আগস্ট ৯— বৃষ্টিপাত গড়ের চেয়ে ৪২% বেশি।

আগস্ট ১০ থেকে আগস্ট ১৫— বৃষ্টির পরিমাণ গড়ের চেয়ে ২৫৫% বেশি।

আগস্ট ১৭— এই একদিনের বৃষ্টি গড়ের চেয়ে ৪২৪% বেশি হয়েছে। (সূত্র: টাইমস অভ ইন্ডিয়া)

রাজ্যের নদীগুলি এমনিতে খুব একটা দীর্ঘ নয়, আবার চওড়াও নয়। ফলে এই অতিবর্ষণ-জনিত জলভার বহনের সামর্থ্য তাদের ছিল না। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো তার অপর রাজ্যের ৪৪টি বাঁধের জলাধার থেকে একই সময়ে বিপুল পরিমাণে জল ছাড়া হয়েছিল। তামিলনাড়ুর একটি জলাধার থেকেও ঐ সময়েই জল ছাড়া হয়েছিল, এমন মন্তব্য খোদ কেরল সরকারের।

কেরলের পশ্চিমমুখো নদীগুলির অতিরিক্ত জল সমুদ্রে গিয়ে অনায়াসে পড়তে পারে নি বলে আমার ধারণা। জোয়ারে জল বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্রের জলতল নদীর জলতলের চেয়ে উঁচু হয়ে যায়। ফলে জল নেমে যাওয়ায় বাধার সৃষ্টি (ড্রেনেজ কনজেশন) হয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া রাজ্যের ধানখেতগুলির ব্যবহারও অন্যভাবে করা হচ্ছে বলে খবর। ফলে নদীর কূলছাপানো জলধারা এবং মাটি-ধোওয়া জল (সারফেস রান-অফ) ছড়িয়ে যাবার সুযোগ পায় কম। এছাড়া অপরিকল্পিত উন্নয়নও রাজ্যের প্রাকৃতিক সুস্থিতিকে বিঘ্নিত করেছে। বন্যার ব্যাপকতার এটাও একটা কারণ। এটা সবারই জানা যে, বাঁধের সংরক্ষিত জলাধার থেকে জল ছাড়া হয় তখনই যখন তার আর জল ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে না। বাঁধের সুরক্ষার জন্য জল ছাড়া ঐ পরিস্থিতিতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ৪৪টি জলাধার থেকে একসঙ্গে জল ছাড়ার ব্যাপারটা বিস্ময়কর। সংশয় হয়, বাঁধের ব্যবস্থাপনায় হয়ত কোনো ত্রুটি ছিল। এর প্রমাণ মিলেছে কেন্দ্রীয় জল আয়োগের কেরলের বন্যা-পরবর্তী একটি সমীক্ষায়। এতে বলা হয়েছে, রাজ্যের সব জলাধার বন্যার আগেই সর্বোচ্চমাত্রায় পূর্ণ ছিল যা বাঁধ ব্যবস্থাপনার পরিপন্থী। এ ছাড়া দেখা দরকার, রাজ্যের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল কিনা। যাকে

পরিভাষায় ফ্লাড জোনিং বলে। বন্যার সময় একটা প্রবল ঝড়ও কেরল উপকূলে উঠেছিল। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। বন্যা-পরবর্তী দুর্যোগ সামলাবার জন্য রাজ্য সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাদি নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যও এ ব্যাপারে সহায়তা করেছে। তবে দুর্যোগ মোকাবিলায় কী কী আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, সে তথ্য আমাদের কাছে নেই। শোনা গিয়েছে যে, ভারতীয় আবহ বিভাগ থেকে প্রবল বর্ষণের সতর্কতা রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছিল। আসলে আমরা কথাই শুধু ভাবি, ভেবে দেখি না উন্নয়ন কতটা অনুকূল (সাসটেইনেব্‌ল)। অপরিকল্পিত উন্নয়ন অনেক সময় সরকারকে মেনে নিতে হয় স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশে। তবু বলব, উন্নয়ন, পারিবেশিক সুস্থিতি ও দুর্যোগ-প্রতিরোধী ব্যবস্থা— এই তিনকে মেলানো না গেলে বিপত্তি ভবিষ্যতেও এড়ানো যাবে না। বন্যাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা কার্যত অসম্ভব; তবু তার তীব্রতা ও ব্যাপকতাকে কমানো যায় সংহত সমন্বিত প্রচেষ্টায়।

অনিবার্য কারণে এবার আশীষ লাহিড়ীর ধারাবাহিক রচনা **‘আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি’** প্রকাশিত হল না। পরের সংখ্যায় যথারীতি।

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার **ফোন নম্বর**: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০ -১২৬৩৭।

বখে যাওয়ার সেকাল একাল

অরুণালোক ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

ঘড়ির কাঁটাকে যদি আর একটু পিছিয়ে দিই, এই কলকাতা শহর যখন গড়ে উঠছে, সেই সময়ের অবস্থাটা কীরকম ছিল? কলকাতা বাদে বঙ্গদেশের অন্যান্য জায়গায় তখন মূলত বৈষ্ণবগীতি, সংকীর্তন, শাক্ত-ভক্তিগীতির চর্চা। দিল্লী, লখনউ, মুর্শিদাবাদে তখন নবাবি জমানা অস্তমিতপ্রায়। বাঈজিরা তখন নব্য শহর কলকাতায় ভিড় জমিয়েছেন। বাবুয়ানির ধ্বজায় হাওয়া লাগিয়ে কলকাতায় পত্তন ঘটল গজল-ঠুংরি গানের। কিন্তু সে তো পয়সাওয়ালা মানুষদের জন্য। আমজনতা মজে গিয়েছিলেন কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই বা পক্ষিদের গানে এবং পরবর্তীতে নিধুবাবুর গান যা টপ্পার আঙ্গিকে সুপ্রসিদ্ধ। সামাজিকভাবে এইসব গান বা তাদের গায়কী জনপ্রিয় হলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই রুচিহীন বলে পরিগণিত হত। হরু ঠাকুরের খেউড় এবং লহর বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বলছেন, ‘দুঃখের বিষয় এই যে, (খেউড়) অতি জঘন্য ,অতি ঘৃণিত, অশ্রাব্য, অবাচ্য শব্দে পুরিত হইত...’। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কবিগান অনুমোদন করেন নি। তিনি লিখছেন, ‘একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়, এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ের বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলির আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল।’ নিধুবাবুর টপ্পায় আদিরসের কতটা আধিক্য তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত গান গাওয়াকে তির্যক-দৃষ্টিতেই দেখা হত। পেশা হিসাবে গ্রহণ করার তো প্রশ্নই ছিল না। এমনকি তার পরেও ছেলেছোকরাদের আধুনিক গান বা ফিল্মি গান গুনগুনানো— এক ধরনের বাচালতার পর্যায়ে পড়ত।

এবারে আলোচনা করি নাটক বা সিনেমা বা যাত্রায় অভিনয় করা বা দেখার কথা। শুরু করি সুকুমার রায়ের ‘সৎপাত্র’ গঙ্গারামের ছোট ভাইয়ের কথা দিয়ে। তার সম্বন্ধে সুকুমার লিখছেন, ‘কনিষ্ঠটি তবলা বাজায়, যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়’। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও তবলা বাজানো বা যাত্রাদলে

কাজ করাকে কিছুটা হলেও খারাপ চোখে দেখা হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই কলকাতা তথা বাংলায় ইংরেজরা জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। ইংরেজদের সঙ্গে এদেশে এল ইংরাজি মদ আর শেক্সপিয়ার। নবজাগরণের কাণ্ডারী— হিন্দু কালেজের নব্য যুবকেরা এবং তৎকালীন কলকাতার কিছু 'বাবু'র পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হল নাট্যচর্চা। গোল বাধল স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করা নিয়ে। বঙ্গসমাজে থিয়েটারে বা যাত্রাপালায় অভিনয় করাকে এতটাই নীচু চোখে দেখা হত যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা সেখানে অভিনয় করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। প্রথমদিকে পুরুষরা দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে এবং পরবর্তীতে বারাঙ্গনাদের ধরে এনে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করানো হত। তাতে চতুর্দিকে একটা গেল গেল রব কিন্তু উঠেছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট থেকে শুরু করে অমৃতবাজার পত্রিকা সব পত্রিকাতেই বিরূপ সমালোচনা, বিদ্যাসাগরের মত মানুষও রুষ্ট। তৎকালীন গোঁড়া সংরক্ষণশীল হিন্দু সমাজ খুব স্বাভাবিকভাবেই এহেন থিয়েটার বা যাত্রা বা কবিগানের আসরে যাওয়াকে বা এর সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে, বখে যাওয়ার নামান্তর বলেই মনে করত।

এবার দু চার কথা সিনেমা সম্বন্ধীয়। 'রাজা হরিশচন্দ্র' ভারতে মুক্তি পেয়েছিল ১৯১৩ সালে। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রই হয়ে ওঠে জন-সংযোগের সব থেকে শক্তিশালী মাধ্যম। প্রথমদিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী। ১৯৩১ সালে মুক্তি পেল প্রথম সবাক সিনেমা 'আলম-আরা'। সঙ্গীত-প্রেম-ভালোবাসা সমৃদ্ধ এই সিনেমা এক নতুন জঁর বা রীতির জন্ম দিল। দেশাত্মবোধর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিষয় পরিবেশিত হতে শুরু করল চলচ্চিত্রে। ১৯৩৯ সালে অশোক কুমার-দেবিকা রানী অভিনীত 'অচ্ছুত কন্যা' হল সুপার হিট। চলচ্চিত্রের বিষয় ছিল হরিজন কন্যার সঙ্গে উচ্চ বর্গের ছেলের প্রেমকাহিনী। লক্ষ্য করুন চলচ্চিত্রের বিষয় কিরকম পাল্টে যাচ্ছে। বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ প্রায় অবাস্তব। সামাজিক লক্ষণরেখার গণ্ডীর বাইরের সেই স্বপ্নিল না পাওয়ার জগৎকে সিনেমার পর্দায় সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলে, সিনেমা হয়ে উঠল তুমুল জনপ্রিয়। আজ যদিও সেই লক্ষ্মণরেখার পরিধি অনেক বেড়ে গেছে, তবুও আনসেন্সর্ড বা নিষিদ্ধ ছবি দেখার প্রবণতাকে এখনও 'সুবোধ বালক'এর লক্ষণ বলে মনে করা হয় না, তখনকার যুগে তো হতই না। স্বাধীনতা পরবর্তী যুবমানসে সিনেমার প্রভাব অনস্বীকার্য। আগেই বলেছি চুলের স্টাইল, ফ্যাশন, চলন-বলন, সিগারেট খাওয়া, নেশা করা, প্রেম করা— সবেতেই সিনেমার প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। রিয়েল লাইফ হিরোরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ে সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে দেশের যুবমানসে ফিকে হয়ে যাচ্ছিলেন। সিনেমার প্রভাব ছাত্র-যুবমানসে এতটাই পড়েছিল, যে স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখা অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এবং এটি এক বদ অভ্যাস বলেই পরিগণিত হত— সেকথা আমরা সুনীলের লেখায় পেয়েছি। চাকরির অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা কদর বাড়াচ্ছিল রিল-লাইফ হিরোদের। তিন ঘণ্টার এই আমোদ সাময়িকভাবে হলেও যুবক-যুবতীদের এক রূপকথার জগতে নিয়ে যেত। সাময়িক এই মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ানোকে অনেক ক্ষেত্রেই বখে যাওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ বলে মনে করা হত।

আলোচনা করতে করতে বখে যাওয়ার আর একটি মানদণ্ড উঠে এল। সেটি হল— সামাজিক বিধিনিষেধ। সমাজ বা সমাজের কোনও মান্যগণ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু কার্যকলাপকে বখে যাওয়ার সূচক বলে মনে করা হত। সেটি অনেক সময়েই ছিল আপেক্ষিক এবং সময়ের সরণিতে হয়তো সেইসব সূচক প্রায়শই অবান্তর হয়ে যেত। হুতোম তাঁর নক্সায় লিখছেন— 'পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোনো কোনো গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা যেমন মেয়েদের সাঁঝ সকালে ঘাটে যাবার পূর্ব্বে, পথের ধারের পুরণো শিবের মন্দির, ভাঙ্গা কোটা, পুকুর পাড় ও ঝোপে ঝাপে লুকিয়ে থাকে...'। 'Peeping Tom'-দের আচরণ যুগে যুগেই বখাটেপনার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। পরবর্তী ঘটনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুত্রসম্বন্ধীয়। ১৮৭৫ সালে তৈরি করা উইলে তিনি লিখছেন— 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এ জন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাহার সংশ্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি।' অথচ এই নারায়ণচন্দ্রই কিন্তু ১৪ বর্ষীয়া বিধবা ভবসুন্দরীকে বিয়ে করে পিতার মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন! শম্ভুচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগর সেকথা স্বীকারও করেছেন। তাহলে কী এমন ঘটনা ঘটল যে, নারায়ণ পিতার চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন? খুব সম্ভবত জনৈক মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের সম্পত্তির থেকে স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে বঞ্চিত করার টানাপোড়েনের কারণে পিতা-পুত্রের মনান্তর ঘটে। তারই ফলস্বরূপ উপরিউক্ত উইল। এই মনোমালিন্য অবশ্য স্থায়ী হয়নি। তবে সে অন্য কাহিনী। বিদ্যাসাগরের মতো সমাজের মাথা যখন ব্যক্তিগত কারণে পুত্রকে বখাটে আখ্যা দিতে ছাড়েন না, তখন সমাজের সূচক যে সবসময় গ্রহণযোগ্য হয় তা নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন — 'বাবার ধারণা ছিল, দুপুরবেলা যারাই বেরোয়, তারাই বখে যায়। আমাকে বেরোতে দেওয়া তো হতই না, বরং একটা কঠোর ও খারাপ কাজ করতে দেওয়া হত। সেটা হচ্ছে টেনিসনের কবিতা অনুবাদ করা...'। যুগ পাল্টায়, বাবাদের মানসিকতা কি খুব পাল্টায়? সুনীল অন্য আর এক জায়গায় লিখছেন— 'তখন অনেক লোক বলত, এখনও কেউ কেউ বলে যে, ছোটরা বড়দের বই পড়লে চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, কিংবা বখে যায়। এই সব

কথার জ্বলন্ত প্রতিবাদ আমি নিজে। গোঁফ গজাবার আগেই আমি শত শত গল্পের বই, তার মধ্যে 'চিতা বহ্নিমান' কিংবা 'অথৈ জলে'-র মতন বইও ছিল, কিন্তু তার জন্য আমার চরিত্র খারাপ কিংবা বখে যাবার মতন কিছুই হয়নি। আমার আর যত দোষই থাক, এ রকম কোনও অভিযোগ কখনও শুনিনি'। বখে যাওয়া নির্ণায়ক আর এক অদ্ভূত সূচক!

সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপট, অল্প বয়সের আবেগপ্রবণতা, প্রাজ্ঞতার রকমফের, এ সবের ওপরেই নির্ভর করে কে বখাটে, আর কে নয়? তিন যুগের তিনটি উদাহরণ দেব— প্রথমটি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭ সালে) পরে। কলেজের পড়ুয়ারা 'কালেজ বয়' হিসাবে বেশি পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই পোশাক, খানাপিনা এবং ব্যক্তিগত আচার-আচরণে প্রচলিত হিন্দু রীতি-নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তৎকালীন হিন্দুসমাজে এবং অভিভাবকদের অনেকেরই ধারণা হয়েছিল— নব্যশিক্ষা লাভ করে, এই 'কালেজ বয়'রা এক্কেবারে বখে গিয়ে, উচ্ছন্নে যেতে বসেছেন। সমসাময়িক এক ইংরাজি কাগজে লেখা হল— হিন্দু কলেজের ছেলেরা নাকি 'Cutting their way through ham and beef and wading to liberalism through tumblers of beer'। কিন্তু রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু— এঁরা যখন বাংলার নবজাগরণের কাণ্ডারী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন বখে যাওয়ার তত্ত্ব আর একবার ভুল প্রমাণিত হল। দ্বিতীয় উদাহরণটি হল স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কালে। যে সব যুবক সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের গুপ্ত কার্যকলাপের জন্য সমাজের চোখে তাঁরা ছিলেন ধিক্কৃত এবং অবজ্ঞার পাত্র। একমাত্র সহানুভূতিশীল কতিপয় মানুষজন ছাড়া তাঁদের অধিকাংশেরই বখে যাওয়া এবং বিপথগামী তকমা জুটত। তৎকালীন সমাজ তাদের ধিক্কার জানালেও সময়ের কষ্টিপাথরে আজ তাঁরা চিরস্মরণীয়। তৃতীয় এবং শেষ উদাহরণটি হল সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের। সেখানেও যুবসম্প্রদায়, সেখানেও শয়ে শয়ে ছাত্র কলেজ ছেড়ে শুধুমাত্র আদর্শ সম্বল করে এক স্বপ্নিল অনিশ্চয়তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যেহেতু এইসব যুবক-যুবতীরা বেশিরভাগই শিক্ষিত এবং আদর্শ-চালিত, এদের সরাসরি বখাটে আখ্যা না দিলেও, সামাজিকভাবে এদের কার্যকলাপ খুব গ্রহণযোগ্য ছিল না।

> সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন, 'বাবার ধারণা ছিল দুপুরবেলা যারাই বেরোয় তারাই বখে যায়। আমাকে বেরোতে দেওয়া তো হতই না, বরং একটা কঠোর ও খারাপ কাজ করতে দেওয়া হত। সেটা হচ্ছে টেনিসনের কবিতা অনুবাদ করা...'

রকবাজি বা রকের আড্ডা নিয়ে দু-চার কথা না বললে বখে যাওয়ার ষোলো কলা পূর্ণ হয় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রকের আড্ডারও রকমফের ঘটে যেত। রকবাজিকে কদর্থে বেকার যুবকদের ঠেক মনে করা হত। সেখানে রাজা উজির মারা থেকে শুরু করে, দেশোদ্ধার করা, মেয়েদের টিপ্পনী কাটা, তাদের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স, পরিধান, কেশসজ্জা— সবই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। তার সঙ্গে চলত ধূমপান। স্বাভাবিক কারণেই রকবাজ ছেলেরা বখে গিয়ে একেবারে গোল্লায় গিয়েছে বলেই ধরে নেওয়া হত। এই প্রসঙ্গে 'তিন ভুবনের পারে' ছবির রকবাজি এবং 'জীবনে কি পাব না' গানটি স্মর্তব্য। রকে ব্যবহৃত ভাষা এবং শব্দাবলী যে সভ্য সমাজে খুব সাদরে গৃহীত হয়েছিল- তা কিন্তু নয়। বরং তার ব্যবহার কথ্যভাষাতেও সযত্নে পরিহার করা হত। নকশাল আন্দোলনের ধরপাকড়ের সময় থেকে এবং পরবর্তীতে বহুতলের ঔদ্ধত্যে এবং অধুনা ফেসবুক আর হোয়াটস অ্যাপ এর দাপটে, রোয়াকের সঙ্গে সঙ্গে রকবাজিও চলে গেল ইতিহাসের গর্ভে।

প্রশ্ন জাগে, বখে যাওয়া কি শুধু মাত্র ছেলেদের একচেটিয়া ব্যাপার, না মেয়েরাও বখে যেতে পারে? নিশ্চয়ই পারে। আমাদের ছাপোষা বাঙালি সমাজে এখনও গড়পরতা মেয়েদের নিয়তি হল বিয়ে। সে মেয়ে উপার্জন করুক বা না করুক। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক যশোধরা রায়চৌধুরী লিখছেন— 'তবু, সমাজকে মেনে চলা, কনফর্ম করে চলা, এর কিছু অ্যাডেড ভ্যালু আছে। আপোষ করে ছাপোষা হবার আরাম। অর্থাৎ গৃহীত, স্বীকৃত মূল্য। লোকে কম কানাকানি করে, লোকে কম নিন্দে করে, কম অবাক হয়। লোকে তির্যকভাবে তাকায় না। অথবা, "আন ইন্টারেস্টিং ভাবে"। যেটা একটা সুখের কথা, অবশ্যই। কেননা, অনর্থক জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা কোনো কাজের কথা নয়।' আর যে মেয়েটার অর্থনৈতিক কারণে বিয়ে হল না, তার পরিণতি কী হতে পারে তার বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রীমতী রায়চৌধুরী লিখছেন— 'মুখে ছুলির দাগ, চুলে হেনার ছোপ কত ১৬ পেরনো মেয়ে ১৮ হয়ে ২০ থেকে ২৫ হয়ে যায়, একদিনের জন্য অনেক গয়না পরার আশায় আশায়। আর বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না থাকার দুঃখে দুঃখে। স্বপ্ন বা লটারি বা ইউটোপিয়ার জন্ম হয়ে অবসানও হয়। মেয়েটা হয়ত এভাবেই বয়স্ক হয়। নয়ত বাড়ি থেকে পালিয়ে, বখে গিয়ে ভেসে যায়। "ভেসে যাওয়া" মানে আসলে 'সমাজচ্যুত হওয়া'। বিয়ের আড়ালে থেকে বখে যাওয়ার উদাহরণ সেই সাহেব বিবি

গোলামের কেতাবি ছোটবউঠানের চরিত্র থেকে বাস্তব জীবনের গীতা দত্ত, মীনাকুমারী বা অ্যামি ওয়াইনহাউস। কেউ সাংসারিক জীবনে অসুখী, কেউ প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা, আবার কেউ বৈভবের বাহুল্যে বেসামাল। সকলেই প্রথাগত জীবনধারার বাইরে গিয়ে শান্তি পেতে চেয়েছেন। যে পথ তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন, সমাজ সেই পথকে সুস্থ বলে অনুমোদন করেনি, ফলত তাঁরা সামাজিকভাবে চ্যুত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন, এবারে এখনকার সময় নিয়ে। শুরু করি ২০১৪ সালের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হোক কলরব' আন্দোলন দিয়ে। আন্দোলনের কারণ ছিল কোনো কারণে উপাচার্যকে ঘেরাও করে থাকা ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জ। সেদিন সমাজের আপামর জনসাধারণ কলেজ চত্বরে পুলিশি কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে 'হোক কলরব' নামের এই আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলনের বিপুল জনপ্রিয়তার পেছনে যে প্রশ্নগুলো অনুচ্চারিত রয়ে গেল— ১) বিদ্যাঙ্গনে উপাচার্য বা শিক্ষকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব তাহলে কার? ২) বিদ্যাঙ্গনে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে কি আইন-কানুনের লক্ষ্মণরেখাটি খুব ঝাপসা? এরই সূত্র ধরে ঐ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুটি আন্দোলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রথম ঘটনায় নীতি পুলিশের বিরুদ্ধে, কোচিতে এক তরুণ-তরুণীর প্রকাশ্যে চুমু খাওয়ার প্রতিবাদে একটি রাজনৈতিক দলের 'দাদাগিরি'র বিরুদ্ধে, খাস কলকাতার স্টার থিয়েটারে ছোট পোশাক পরিহিত তরুণীকে ঢুকতে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং এমন নানা ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই ৫ই নভেম্বর, ২০১৪ সালে 'চুমু আন্দোলনে' সামিল হয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রী। চার রাস্তার মোড়ে পরস্পরকে জাপটে ধরে চুমু খাচ্ছেন একপাল তরুণ-তরুণী। মুখে স্লোগান— 'আমার শরীর আমার মন, দূর হটো রাজশাসন'। দ্বিতীয়টিতে লিঙ্গবৈষম্য, শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের প্রতিবাদে স্যানিটারি ন্যাপকিনকে হাতিয়ার করেছিলেন যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীরা। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পড়ুয়া তাঁদের স্লোগানগুলি লিখেছিলেন স্যানিটারি ন্যাপকিনে। তাতে ছবিও আঁকা হয়েছিল। তার পর সেগুলি সেঁটে দেওয়া হয়েছিল ক্যাম্পাস জুড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্যানিটারি ন্যাপকিন সেঁটে প্রতিবাদের ধরন নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, এ কথা মেনে নিয়েও তাঁদের সাফ কথা ছিল, আন্দোলনকারীদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না এবং তা হয়ও নি। তবে একে কি অত্যন্ত স্থূলরুচির সমষ্টিগত বখাটেপনা বলব, নাকি উদারমনের ভবিষ্যৎ দর্শন বলব? মানসিকভাবে কি আমরা তবে তৈরি হয়ে গেলাম প্যারিসের সারবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বার্ন দ্য ব্রা', ইউক্রেনের 'ফিমেন' অথবা আমেরিকার 'ফ্রি দ্য নিপল' এর মতো শরীর উন্মোচনকারী আন্দোলনকে মান্যতা দেওয়ার জন্যে? এক এবং একমাত্র ভবিষ্যৎই পারবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে। প্রকাশ্য স্থানে স্বমেহন বা সঙ্গম করলে বোধহয় সেটিও কোনোদিন সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। বখে যাওয়ার সূচক তখন হয়তো বা অন্যকিছু হবে!

শেষ করব বখে যাওয়া কী করে আটকানো যায় সে বিষয়ে দু-চার কথা আলোচনা করে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, বখে যাওয়া মানেই, জীবনের সব শেষ হয়ে যাওয়া নয়। এই লেখকের বাল্যকালে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের দুটি ছাত্রী বিতাড়িত হয়েছিল স্কুলচত্বরে প্রকাশ্যে সিগারেট খাওয়ার জন্যে। সত্তরের দশকের মফঃস্বল শহর, তায় মেয়ে করছে ধূমপান। খুব স্বাভাবিকভাবেই চতুর্দিকে ঢি ঢি পড়ে গেল। তিন বছর পরে মৃণালিণী গার্লস হাই স্কুল থেকে ঐ কন্যাদ্বয় হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান করে নিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের আর নকশাল আন্দোলনের তথাকথিত সমাজচ্যুত ছেলেমেয়েদের আদর্শ বা শিক্ষাদীক্ষা বা চিন্তাভাবনা হয়তো সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিল, যেটা রক্ষণশীল অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা কিছুটা ভীরু সমাজের পক্ষে হজম করা কষ্টকর ছিল। ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণে বাড়ির বড়দের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাদা রং কে সাদা বলা আর কালো রঙের পরিচিতি কালোতেই করানো, বা নিজস্ব অধিকারবোধের পরিমিতি সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়াটাও অভিভাবকত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। সিনেমার নান্দনিক মূল্য বাড়ানোর জন্য শরীর প্রদর্শন আর ব্লু ফিল্মের তফাৎ যখন কেউ অনুধাবন করতে পারবে, সার্থক হবে সেই শিক্ষা, বখাটে হয়ে উঠবে প্রাজ্ঞ।

সূত্রাবলী

১ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ— শিবনাথ শাস্ত্রী
২ চলমান প্রসঙ্গ— চণ্ডী লাহিড়ী
৩ হুতোম প্যাঁচার নকশা— কালীপ্রসন্ন সিংহ
৪ মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়–টেকচাঁদ ঠাকুর
৫ খাই খাই— সুকুমার রায়
৬ আবোল তাবোল— সুকুমার রায়
৭ পায়ের তলায় সর্ষে— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৮ কলকাতা— শ্রীপান্থ
৯ বাঙালীর আড্ডা— সম্পাদনা লীনা চাকী
১০ বিবাহ— যশোধরা রায়চৌধুরী

উমা

মিডিয়ার প্রচার–স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে আর্থিক বিকাশও ধাক্কা খায়!

শৈবাল কর

মিডিয়ার স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে গণতন্ত্র পথে বসে। এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলতেই থাকে। যে গণতান্ত্রিক সরকার গদিতে আসীন, তারা এই কারণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে মুক্ত মিডিয়াকে প্রশ্নাতীতভাবে সমর্থন করে যায়, তা কিন্তু একেবারেই নয়। মাঝেমধ্যেই তথ্য–সংস্কৃতি মন্ত্রক সংবাদ
সংস্থার প্রতিনিধিদের কণ্ঠরোধ করার যাবতীয় প্রয়াস করে চলে। ভুল সংবাদ পরিবেশন করলে সাংবাদিকদের জেলহাজত হতে পারে, এই সম্ভাবনাও কয়েকদিন আগে সৃষ্টি হয়েছিল মন্ত্রীর প্রস্তাবে। প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপে এই প্রস্তাব নাকচ হয়েছে। তবে, সরকারের তরফে এমন
ভরসাও দেখানো হয় নি যে, ভবিষ্যতে এ জাতীয় খামখেয়ালিপনা গুরুত্ব পাবে না বা সে জন্যে শাস্তিও হতে পারে। আসলে, সাংবাদিকদের উপর সরকারি আক্রমণ নতুন নয়— জরুরি অবস্থার কথা কে না জানেন! এছাড়া, সংবাদপত্রের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অবস্থান নিয়ে আপত্তির কারণে কিম্বা বিশেষ কোনো সংবাদের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে খবর আর চ্যানেল সেন্সর করা, ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যাবে কত অসংখ্যবার ঘটেছে। এরকম ক্ষেত্রে, সংবাদপত্র বা বিনোদনের মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণের কারণে অর্থনৈতিক পরিবেশও কতটা বিঘ্নিত হয়, তার মূল্যায়ন বিশেষ জরুরি। সংবাদ পরিবেশন করা না গেলে কিছু প্রত্যক্ষ ক্ষতি হয়, কাগজ বিক্রি আর বিজ্ঞাপন বাবদ। আরও
অনেক ক্ষতি হয় অপ্রত্যক্ষ কারণে। এটি স্বল্প আলোচিত।

২

সরকার, কর্পোরেট সংস্থা এবং মিডিয়া কীরকমভাবে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে পড়ে তার ইতিহাস প্রাচীন। সত্যি বলতে কি, উন্নত গণতন্ত্রের হাত ধরে এমন কতগুলি অগণতান্ত্রিক ব্যাপার ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবী জুড়ে, যা প্রাত্যহিক ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে রয়েছে সব দেশেই। দেশের
গণতন্ত্র কতটা মুক্ত, তা পরিমাপ করার একটা রাস্তা হল মিডিয়া কতটা স্বাধীন তা বিচার করা।

কিন্তু এটা সহজেই বোঝা যায় যে, মিডিয়ার রাশ কার হাতে রয়েছে, তা না বুঝে গণতন্ত্রের বিচার করা সমীচিন নয়, কারণ গণতান্ত্রিক সরকারই যখন মিডিয়ার পরিচালক, তখন তা একেবারেই নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা করবে না, তা বোধ হয় হওয়ার নয়। অগণতান্ত্রিক সোভিয়েত, চীন, জরুরি অবস্থার ভারত এবং তারপরেও গণতান্ত্রিক ভারতে সরকারি মিডিয়া, ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে শুধুই শেখানো সরকারি বুলি প্রচার করে থাকে। তবে এর প্রবর্তন তিনশো বছর আগে।

কে না জানেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেমন করে ব্যবসায়ী থেকে ভারতবিধাতা হয়ে বসে কিছু বছরের মধ্যে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তন হওয়ার কিছুদিন আগে সৃষ্টি হয় সাউথ সি ট্রেডিং কোম্পানি— মূলত দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা করবার জন্য। দক্ষিণ অতলান্তিক মহাসাগরে
তখন স্পেনের জাহাজের রমরমা। ইংরেজদের দক্ষিণ আমেরিকায় রাজত্ব করার সুযোগ কম, কিন্তু ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে আখের চাষ, মধ্য আমেরিকার কিছু জায়গায় তামাকচাষ হয়ত খানিকটা আধিপত্য কায়েম করতে সাহায্য করবে। তবে সরকার থেকে এই পথে ব্যবসা করার ছাড়পত্র লাগবে।

এখনকার মতনই, সেই সময়েও সরকারি আধিকারিকরা খালি হাতে কিছু করতেন না। তবে ব্যবসায়ীর দেওয়া উপরি কয়েকজন পাবে, না সরকার স্বয়ং, সেটা খানিকটা নির্ভর করে প্রাতিষ্ঠানিক গঠনের উপর। শক্তিমান সরকার সরাসরি চুক্তি করল কোম্পানির সঙ্গে। ব্রিটিশ সরকারের তখন
বাজারে ৯৫ লক্ষ পাউন্ড ধার। অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে এবং ইংল্যান্ড জিতেওছে; কিন্তু খরচ হয়েছে প্রচুর। সরকার সাউথ সি কোম্পানিকে ব্যবসা করার অনুমতি দিল এই শর্তে যে, তারা সরকারের সম্পূর্ণ ধার নিজেদের কাঁধে নেবে এবং তার পরেও সরকারকে রোজগারের ৬% দেবে বাৎসরিক হারে। এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়ভার বহন করবে যে কোম্পানি,

তাদের মুনাফা হতে হবে ততোধিক! তবে প্রথমে প্রয়োজন বিপুল বিনিয়োগ। এ ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে মিডিয়ার কাছে। সরকারও তাতে মদত দেবে অনায়াসে। কিছুদিনের মধ্যেই লন্ডন থেকে এবং গুরুত্বপূর্ণ সব প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রতিবেদন দেওয়া শুরু হল যে অতলান্তিকে ব্যবসার রাস্তা খুলে গিয়ে ইংল্যান্ড কি বিরাট পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে চলেছে! সাউথ সি কোম্পানির শেয়ার কিনতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, এমনকি বিখ্যাত রাজনীতিকরাও

শেয়ার কিনতে উন্মুখ হলেন। এর পরের অধ্যায় অনেকে জানেন। দক্ষিণে জাঁকিয়ে বসা স্পেনের ব্যবসার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে সাউথ সি কোম্পানি লাটে উঠল এবং হাজার মানুষ কপর্দকশূন্য হলেন। মুক্ত মিডিয়া আসলে কতটা স্বাধীন চিন্তা করতে পারে, সেই বিতর্ক আজও বহাল।

গত দশক থেকেই মিডিয়া বলতে শুধুমাত্র ছাপা সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিন মিডিয়া বোঝায় না। বিগত কুড়ি বছরে তথ্য ও সংবাদ পরিবেশনে ইন্টারনেটের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে, সামগ্রিক প্রথা প্রবর্তন ও নিয়ন্ত্রণে সরকারের কাজ বেড়েছে। তবে ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব বাড়লেই যে সরকারের বিচারবুদ্ধি বাড়বে এমন তো কথা নেই। প্রসঙ্গত, সরকারি আধিকারিকদের ই-মেল পাঠিয়ে তারপরে ফোন করে সেটা জানাতে হয় এবং তবে তাঁরা ই-মেল পড়েন। এঁদেরই সহকর্মীদের উপর মাঝে-মাঝে দায়িত্ব বর্তায় যে কোন ইন্টারনেট সাইট খুলে রাখতে হবে, আর কোনটি দেশের মধ্যে বন্ধ করিয়ে দিতে হবে। এর মধ্যে পর্নো সাইট নিয়ে আপত্তির সুযোগ কম, কারণ স্বল্পশিক্ষিত এবং ধর্ম নিয়ে অস্থির দেশে লাগামহীন যৌনতা আর পরমাণু বোমার সুইচ হাতে পাওয়া প্রায় একই কথা। তবুও, ব্যক্তিস্বাধীনতা নিঃসন্দেহে খর্ব হয় এতে। এক্ষেত্রে অন্যান্য মিডিয়ার ভূমিকা শুধুই দর্শকের, কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সঙ্গে অন্য মিডিয়ার প্রতিযোগিতা নেই একেবারেই। অন্য ক্ষেত্রেও সরকারের খুশিমতো সেন্সরশিপ করার প্রবণতা কমছে তো নাই, বরং বেড়ে চলেছে। ২০০৩-০৪ সালে বেশ কিছু সাইট আর গত কয়েক বছরে ৮৩৫টি মতন সাইট সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে খবর বিষয়ক সাইট থেকে খেলার সম্প্রচার করে এমন সাইট সবই রয়েছে। ফ্রিডম হাউস নামে তথ্য-সংগ্রাহক এবং বিশ্লেষক সংস্থা বলছে, ভারতে মিডিয়ার স্বাধীনতা আংশিক;

রেটিং ৪১ (শূন্য সবচেয়ে ভাল, ১০০ সবচেয়ে খারাপ), আর সামগ্রিক স্থান ৬৫টি দেশের মধ্যে ২৯। ২০১১-র তুলনায় ২০১৫-র অবস্থান খারাপ হয়েছে। অপর একটি গোষ্ঠী, 'সীমা-বিহীন সাংবাদিক' বা 'রিপোর্টার উইদাউট বর্ডারস' জানাচ্ছে, ভারতে সেন্সরশিপ মিডিয়া স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৮, অর্থাৎ, বেশ নিচের দিকে। এটি কোনো দেশের অর্থনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। উদাহরণটি অন্য বিনোদনের ক্ষেত্রেও খানিকটা প্রযোজ্য। ইদানীং কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় ফোন কোম্পানির সাহায্যে অনেকগুলো খেলার সাইট ভারতে বন্ধ করে দিয়েছে। এগুলো মূলত বিদেশি ফুটবল, বাস্কেটবল, রাগবি, বেসবল ইত্যাদি সম্প্রচার করত বিনা পয়সায়। পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে দেখা যেতে পারে। মনে রাখবেন, ইন্টারনেট সংযোগ বাবদ টাকা আপনাকে দিতেই হচ্ছে, সুতরাং পুরোটাই বিনা পয়সায় নয়। এই সুযোগে দেশের সরকারি-বেসরকারি ফোন পরিষেবা প্রদানকারীর মুনাফাই হত। তা সত্ত্বেও বন্ধ করা হল কেন? ভারতে যারা টিভি মারফত খেলা বিক্রি করে, সেই বিদেশি বেসরকারি

চ্যানেলগুলোর ক্ষতি হচ্ছে বলে। গত আর্থিক বর্ষে শুধু আইপিএল বাবদ স্টার স্পোর্টস খরচ করেছে ১৩,৩৪৭ কোটি টাকা। প্রচারিত বিজ্ঞাপন থেকে তা আদায় করতে হবে তো? যেমন, সোনি বিজ্ঞাপন বাবদ রোজগার করেছে ১৩০০ কোটি। প্রখর গ্রীষ্মে ক্রিকেট না দেখে লোকে যদি ফুটবল দেখতে চায়, তা হলে বিজ্ঞাপন আসে না। ভারতের আইএসএল ফুটবল লিগের স্বত্ব বিক্রি হয়েছে মাত্র ২০০ কোটি টাকায়। বিজ্ঞাপন কম পেলেও খুব অসুবিধে নেই। এদিকে বিদেশি ফুটবল দেখতে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাই ডেফিনেশন চ্যানেল কিনতে হবে। সুতরাং বহু লক্ষ ফুটবলপ্রেমী নির্ভর করেন ইন্টারনেট সাইটের উপর। সেখানেও থাবা বসাচ্ছে সরকার। কারণ চ্যানেলগুলো থেকে চাপ আসছে। হুঁ হুঁ বাবা, এ তো গরিবের ক্রিকেট দেখা নয়- উন্নততম পর্যায়ের ফুটবল খেলা। গা-জোয়ারি খরচ করে

দেখতে হবে। রোজ প্রায় বিনা পয়সায়, কারণ দূরদর্শনও কিছু দেরিতে একই খেলা সম্প্রচার করে, ক্রিকেট খেলা দেখলে তবেই তো গাঁ-গঞ্জ থেকে ক্রিকেটার তৈরি হবে আর আইপিএল নামের সার্কাসে সুযোগ পাবে! যে খেলায়, প্রায় যে কেউ কথায় কথায় বিশাল বড় কৃতিত্ব করে ফেলতে পারে, সেটা খুব কঠিন কিছু হতে পারে কি? বাস্কেটবল কিংবদন্তী কোবে ব্রায়ান্ট একবার বলেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন হওয়া যদি সহজই হবে, তাহলে আর চ্যাম্পিয়ন হয়ে লাভ কি? আমাদের সরকার চাকরি সৃষ্টি করতে পারে না, তাই আইপিএলে খেলোয়াড় তৈরিতে সহানুভূতিশীল। এর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যে পদ্ধতিতে, তা অবশ্য সহজ রাস্তা নয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফুটবল খেলোয়াড়রা ইপিএল-এর সব তারকাকে এক সঙ্গে কিনে নিতে পারেন, কিন্তু গরিব দেশে এই অলীক স্বপ্ন দেখতে সরকার বা মিডিয়া কেউই তেমন জোর দেয় না। অথচ, আফ্রিকার বেশ অনুন্নত দেশের ফুটবল খেলোয়াড়রা যে বিশ্বমঞ্চ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তা একরকম অসঙ্গতি বলেই

মেনে নেওয়া হচ্ছে। আইপিএলের প্রসারকে অর্থনৈতিক উন্নতির একটা পর্যায় বলেই মনে করছে সরকার, কারণ গ্যালারিতে সুন্দর মুখ দেখতে পাওয়া যায়, এ গ্রেড ফিল্মস্টার দেখতে পাওয়া যায়। আইএসএল-এর ফিল্মস্টাররা বি গ্রেড, এবং এদের হাতে ছবিও নেই, দু-একটা বিজ্ঞাপনে পার্ট করেন কখনও-সখনও। ফলে উন্নয়ন যাতে ব্যাহত না হয়, তাই অন্যান্য খেলা প্রচার করে এমন মুক্ত মিডিয়ার কণ্ঠরোধ করে চলেছে সরকার। দুঃখের কথা, অধিকাংশ মিডিয়াও এই গড্ডালিকা প্রবাহে বিশ্বাসী। এই গোটা বিষয়টি কিছু হিংসুটে লোকের সৃষ্টি করা চক্রান্ত তত্ত্বের মতন শোনালেও, আর্থিকভাবে দুটি প্রভাব পরিষ্কার। এক, যেহেতু বহুল-প্রচারিত খেলা মাত্র এক ধরনেরই রয়ে যাবে এই দেশে, ফলে প্রচারের টানে সবাই শুধু ক্রিকেট খেলতে চাইবে। অচিরেই খেলোয়াড়ের জোগান উৎবৃত্ত হয়ে মাথাপিছু রোজগার কমতে বাধ্য। তেন্ডুলকার বা কোহলি প্রচুর হয় না। দুই, খেলা দেখতে গেলে সরাসরি হোক বা টিভিতে, মাথাপিছু খরচ বেশি পড়বে, কারণ সরকার মিডিয়ার প্রতিযোগিতা রোধ করে বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াবেই। বিজ্ঞাপন যতই আসুক, মানুষের পছন্দের ঝুড়িতে রোজ একই খাবার পরিবেশিত হলে তাকে উন্নয়ন বলে কি? আসলে, সরকার যখন মিডিয়াকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে তখন একনায়কতন্ত্র হয়। আর মিডিয়ার অর্থ যখন সরকারকে ইচ্ছেমতন নিয়ন্ত্রণ করে তখন একচেটিয়া ব্যবসা হয়। গরম কড়াইতে বসব, নাকি জ্বলন্ত উনুনে, সেটা ঠিক করার সময় এসেছে। **উমা**

ফিবোনাচি ও তার রহস্য সংখ্যারা

বরুণ দত্ত

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতিকে জানবার বা বোঝবার চেষ্টা করে আসছে। এটা দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলো বেশ সঙ্ঘবদ্ধ (কমপ্যাক্ট) হয়ে প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। যার কিছু কিছু জানা গেলেও বেশিরভাগই এখনও অধরা। এমনই এক গণিত ও দর্শনের মেলবন্ধনে সাজানো ফিবোনাচি শ্রেণীর পদগুলিই এই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু।

ফিবোনাচি। ১১৭৫-১২৫০ খ্রিঃ

ইতালির গণিতবিদ লিওনার্দো ফিবোনাচি (L. Fibonacci) খরগোশের বংশবৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি সমস্যার সমাধান করার সময় এই আশ্চর্য শ্রেণীটি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই এই শ্রেণীর পদগুলিকেই ফিবোনাচি সংখ্যা বলা হয়, যার প্রথম কয়েকটি পদ হল—

১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯,... একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, শ্রেণীটির প্রথম পদকে ১ ধরা হয়েছে এবং পরের যে কোনো পদ ঠিক তার পূর্ববর্তী দুটি পদের যোগফলের সমান।

প্রথমেই আমরা দেখতে পাই যে, কোনো স্বাভাবিক সংখ্যাকে (ন্যাচারাল নাম্বার) এক বা একাধিক ফিবোনাচি সংখ্যার যোগফল রূপে প্রকাশ করা যায়, যেমন ৭ = ২+৫, ১১ = ১+২+৮, ১৯ = ১+২+৩+১৩ ইত্যাদি। মজার ঘটনা হল, অষ্টম শতাব্দীর আগেই সংস্কৃত সাহিত্যে পদ্যের শ্লোকে এই সংখ্যাগুলির উপস্থিতি চোখে পড়ে। মৌচাকের গঠনপ্রণালীতে, পাইওনিয়ার কিপ্যাডের সাদা ও কালো নোটসগুলোও অদ্ভুতভাবে এই শ্রেণীর পদগুলি মেনে চলে। এই বৈচিত্র্যময় সংখ্যাগুলি প্রাকৃতিক জগতেও দিব্যি ছড়ি ঘোরায়।

এদের অদ্ভুত উপস্থিতি প্রথম নজর কাড়ে উদ্ভিদ জগতে। ব্যাপারটা বোঝাতে গাছের মূলকাণ্ড এবং ওপরের দিকের শাখাপ্রশাখার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবাক হলেও এটা সত্য যে, অনেক গাছের ক্ষেত্রে মূল কাণ্ডটিকে ১ ধরলে দেখা যায়, ফিবোনাচি শ্রেণীর সংখ্যা ২, ৩, ৫... ইত্যাদি অনুযায়ী পরবর্তী শাখাপ্রশাখাগুলি ভাগাভাগি হয়েছে।

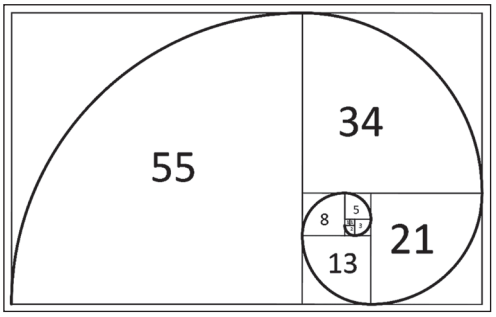

কিছু প্রজাতির গাছের পাতাগুলি একটি নির্দিষ্ট ছন্দে বিন্যস্ত থাকে। গাছের দল

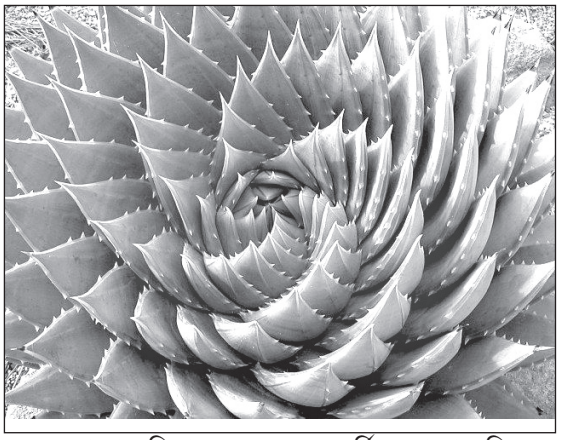

বরাবর পাতার বিন্যাস ও ডালের চতুর্দিকে পাতার বিন্যাসে ফিবোনাচি সংখ্যাগুলি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ১৩–র উপস্থিতি চোখে পড়ে। উদাহরণ— এল্‌ম গাছে (২, ৩), ওক গাছে (৩, ৫) উইলোয় (৮, ১৩) বিন্যাস অনুযায়ী হয়। এবার গাছের ফুলের দিকে তাকালেও ফিবোনাচি সাহেব হাজির!

যেমন কলালিলি ফুলের ১টি পাপড়ি, ইউফাবিয়ার ২টি, লিলির ৩, গোলাপের ৫, ডলফিনিয়ামের ৮, গাঁদাফুলের ১৩, তারাফুল বা ডেজিফুলের ২১, সূর্যমুখীর ৩৪টি পাপড়ি দেখা যায়। সূর্যমুখী ফুলের মাথায় বীজগুলির দিকে তাকালেও অবাক হতে হয়। ঘড়ির কাঁটার দিকে (ক্লকওয়াইজ) বা বিপরীত দিকে (অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ) দেখলে ফিবোনাচি সংখ্যাগুলির (৩৬, ৫৫) বা (৫৫, ৮৯) সাজানো ডালা দেখা যায়। আমাদের অতি পরিচিত ফুলকপিতেও এইরকম বিন্যাস আছে। একইরকমভাবে দেখলে আনারসের খোসার ওপরে এই শ্রেণীর সংখ্যাগুলি ৮, ১৩ ও ২১ আমাদের বিলকুল হতভম্ব করে দেয়।

গাছপালার জগতে ফিবোনাচি সাহেবের কি বিচিত্র কারসাজি! এও কি সম্ভব! আজ্ঞে হ্যাঁ! এটাই দস্তুর। আগ্রহী পাঠক নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আরো আছে, উদ্ভিদজগতে একটি অতিপরিচিত ব্যাপার হল সালোকসংশ্লেষ (ফটোসিন্থেসিস)। সূর্যের আলোকের সাহায্যে গাছের পাতায় সংঘটিত এই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াটাই গাছকে বাঁচিয়ে রাখে। এখানেও ফিবোনাচি সাহেবের অদৃশ্য ছায়া লক্ষ্য করা যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার হল, এই জটিল রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সূর্যালোক যাতে সঠিকভাবে পাওয়া যায়, সেইভাবে গাছটির ডালপালা এবং পাতাগুলি একটি নির্দিষ্ট ছন্দে বিন্যস্ত থাকে। একটি দলের পাতাগুলি যাতে অন্যগুলিকে ছায়ায় ঢাকতে না পারে, অর্থাৎ এখানেও ফিবোনাচি সংখ্যাগুলির অবিশ্বাস্য উপস্থিতি আমাদের অবাক করে দেয়। (নিচের ছবি) লেখা থেকে

এবার প্রাণিজগতে ও মানবদেহের দিকে তাকানো যাক। জার্মান বিজ্ঞানী অ্যাডল্‌ফ ৎসাইসিং দেখিয়েছেন, পশুদের কঙ্কাল ও স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় ফিবোনাচি সংখ্যার নিয়ম রয়েছে। যেমন, আমাদের দুটি হাত, দুটি পা, প্রত্যেকটিতে ৫টি করে আঙ্গুল যার প্রত্যেকটিতে আবার ৩টি করে হাড় রয়েছে। এই সংখ্যাগুলি সবই ফিবোনাচি শ্রেণীভুক্ত। অন্যভাবে দেখলে, মূল দেহটির সঙ্গে রয়েছে ৫টি উপাঙ্গ— ২টি হাত, ২টি পা এবং মাথা। মুখে ৫টি প্রবেশপথ এবং ৫টি ইন্দ্রিয়র সাহায্যে আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদরা এই ম্যাজিক সংখ্যাগুলির উপস্থিতি এবং প্রয়োগ লক্ষ্য করে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। ভবিষ্যতে এগুলিই হয়ত কোনো অজানা রহস্যের সমাধান করে দেবে।

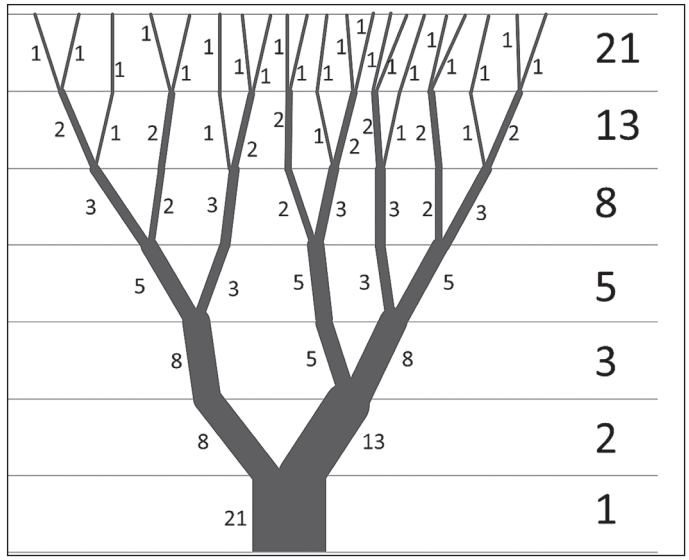

‘জগতের রহস্য উন্মোচনেই বিধৃত তার চিরন্তন রহস্যময়তা।’

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

তথ্যসূত্র

১. সায়েন্স রিপোর্টার (ভল্যুম ৫২ নম্বর ১, জানুয়ারি ২০১৫)
২. জ্ঞান ও বিজ্ঞান (ফেব্রুয়ারি ২০১৭)
৩. টি কোশি— ফিবোনাচি অ্যান্ড লুকাস নাম্বারস উইথ অ্যাপ্লিকেশনস, উইলি ইন্টারসায়েন্স (২০০১)

উমা

অ্যান্টিবায়োটিককে রুখে দেয় যারা

ইন্দ্রনীল ঠাকুর

অ্যান্টিবায়োটিক শব্দটি অল্পবিস্তর আমাদের সকলেরই শোনা। জীববিজ্ঞানের অন্যতম আশীর্বাদ এই অ্যান্টিবায়োটিক। ১৯২৮ সালে আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের গবেষণার সাফল্যে প্রথম যে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয় তার নাম পেনিসিলিন। কিন্তু এই ওষুধের প্রথম প্রয়োগ হয় তার প্রায় এক যুগ পরে, ১৯৪০ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু আহত সৈনিক এর সুফল পেয়ে বেঁচে উঠেছিলেন। শুধুমাত্র সংক্রামক ব্যাধির মোকাবিলাতেই নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখারও অভূতপূর্ব সাফল্যে এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা কম নয়। কিন্ত কী এই অ্যান্টিবায়োটিক? খুব সহজে বলতে গেলে এটি একটি জীবাণুর বংশবৃদ্ধির প্রতিরোধক। এই জীবাণুরা আবার নানান প্রকারের— ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, প্যারাসাইট (পরজীবী) ইত্যাদি। অ্যান্টিবায়োটিক বলতে মূলত ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ প্রতিরোধকারী ওষুধগুলোকেই বোঝায়। অর্থাৎ ছোট্ট করে বলতে ব্যাক্টেরিয়ার বিস্তাররোধী (ব্যাক্টেরিওস্ট্যাটিক) বা ব্যাক্টেরিয়ানাশক (ব্যাক্টেরিয়াসাইডাল) ওষুধই হল অ্যান্টিবায়োটিক। এই লেখার বিষয় কিন্ত অ্যান্টিবায়োটিক নয়। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স (অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স)। তাহলে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বিষয়টা কী তা একটু জেনে নেওয়া যাক। কেনই বা এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা? কারণটি স্পষ্ট, আজকের দিনে এটি একটি জ্বলন্ত সমস্যা। ১৯৪৪ সাল নাগাদ অ্যান্টিবায়োটিকের জনক আলেকজান্ডার ফ্লেমিংই সর্বপ্রথম অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সম্ভাবনার আশঙ্কা করেন। কারণটিও নির্দেশ করেন, অ্যান্টিবায়োটিকের অনুচিত ব্যবহার। জন্ম থেকেই আমরা ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণু দ্বারা পরিবৃত। ব্যাক্টেরিয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ঠিক জন্মাবার আগেই। অর্থাৎ মায়ের প্রসবপথে যে জীবাণু থাকে তাই প্রসবের সময় আমাদের শরীরে প্রবেশের পরে খাদ্যনালীতে অবস্থান করে। সুতরাং বুঝতে পারছেন, আমাদের শরীরের বাইরে-ভেতরে সর্বত্র এদের অধিষ্ঠান। তাহলে কি আমরা ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগের শিকার হয়েই ভূমিষ্ঠ হই? আসলে ব্যাপারটি তা নয়। এই যে হাজার হাজার জীবাণু আমাদের ঘিরে রয়েছে, এদের সকলেই কিন্তু আমাদের শরীরে রোগের সৃষ্টি করে না। সমাজে যেমন বেশ কিছু ভাল মানুষ থাকে, যাদের জন্য পৃথিবীটা আজও চলছে বলে মনে করি, তেমনিই বেশ কিছু ভাল ব্যাক্টেরিয়াও আছে, যারা আমাদের শরীরে সদা-প্রহরীর মতো কাজ করে চলেছে। খাদ্যনালীতে অবস্থানকারী এই ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে আমরা 'প্রোবায়োটিক্স' বলে জানি। বাইরের খাবারের মাধ্যমেও বিভিন্ন বাহ্যিক পদার্থ সহ হরেক রকমের জীবাণু আমাদের পেটে প্রবেশ করে। এই প্রোবায়োটিক্স ব্যাক্টেরিয়া আমাদের শরীরের সহজাত রোগ প্রতিরোধে (ইনেট ইমিউনিটি) অংশগ্রহণ করে। বাইরের বিভিন্ন জীবাণু সহ দূষিত পদার্থগুলিকে শরীরের ভেতর ঢুকতে বাধা সৃষ্টি করে আমাদের আগলে রাখে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধের শুরুটাই হচ্ছে জীবাণুর সঙ্গে জীবাণুর আন্তঃসঙ্ঘাতের মাধ্যমে। প্রকৃতি ও পরিবেশে ছড়িয়ে-থাকা এই হাজারও জীবাণুর মধ্যে মাত্র গুটিকয়েক জীবাণু আমাদের শরীরে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। এদের মধ্যে পরিবর্তনহীন অ্যান্টিবায়োটিকগুলি (ব্যাক্টেরিওস্ট্যাটিক অ্যান্টিবায়োটিকস) ব্যাক্টেরিয়া সংক্রান্ত জীবাণুদের রাজ্যপাট বিস্তারে বাধা দিয়ে এবং ব্যাক্টেরিয়ানাশক অ্যান্টিবায়োটিকগুলি (ব্যাক্টেরিসাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক) একেবারে জীবাণু ধ্বংসে সাহায্য করে। আশ্চর্য লাগে যে, আমাদের শরীরে যত ব্যাক্টেরিয়া বসবাস করে, তাদের মোট সংখ্যা শরীরের মোট কোষ সংখ্যার থেকে বহুগুণ বেশি। ব্যাক্টেরিয়ার দেহে তাদের জিনগুলি বসবাস করে। সুতরাং একথা বলাই যেতে পারে যে, আমরা শরীরে যত না মানুষের জিন বহন করে চলি তার চাইতে বহুগুণ বেশি ব্যাক্টেরিয়ার জীন বহন করি। আর এ ধরনের রোগসৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এরা মারা গেলেও অন্য জীবিত ব্যাক্টেরিয়াগুলির সঙ্গে এদের জিনগত উপাদানগুলির বিনিময় (জেনেটিক এক্সচেঞ্জ) করতে পারে। ফলস্বরূপ নানান নতুন বৈশিষ্ট্যধারী নব্য প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়ার জন্ম হয়। মূলত এই বিশেষ প্রক্রিয়াটিই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ (অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স) নামক সমস্যার জন্ম দেয়। এই নতুন প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়াগুলোর উপর প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। এখন আন্দাজ করতে পারছেন, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ব্যাপারটা ঠিক কি? তাহলে আর

কিছু ধন্দ না রেখে সোজাসুজি বলেই দিই যে, ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার মূল উপাদান অ্যান্টিবায়োটিক যখন ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার কর্মক্ষমতা হারায়, তাকেই বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। একটি রোগ সৃষ্টি হবার জন্য তিনটি উপাদান অত্যাবশক— 'এজেন্ট' অর্থাৎ রোগসৃষ্টির কারণ, 'হোস্ট' অর্থাৎ যার মধ্যে এই রোগ প্রকট হবে আর 'এনভায়রনমেন্ট' অর্থাৎ রোগ সৃষ্টি হবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৃতি ও পরিবেশ। স্বভাবতই আমরা আলোচনা করব এজেন্ট মানে ব্যাক্টেরিয়া এবং হোস্ট অর্থাৎ মানুষ নিয়ে।

বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বর্তমানে যেভাবে অ্যান্টিবায়োটিকগুলি তাদের কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে তাতে আগামী দিনে মনুষ্য প্রজাতি এক ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়তে চলেছে। জীবাণু আছে, মানুষ আছে, আবার রোগ হবার মতো পরিবেশও আছে। তাই রোগ ও রুগী আছে, থাকবে। ভারত জনবহুল দেশ, আত্মীয়তার দেশ, সামাজিক সম্পর্কের দেশ। মনুষ্যত্ব যতদিন বেঁচে থাকবে, মানুষ মানুষের কাছে আসবে। সংক্রামক ব্যাধিরাও ততদিন বেঁচে থাকবে। কিন্ত আমাদের হাতে সেই রোগ মোকাবিলা করার মতো উপযুক্ত অস্ত্র নেই। বিপদটা এখানেই। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের 'ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার'–এর মতো অবস্থা! এমন ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অন্ধকারময় বিভীষিকা! তাহলে সংক্ষেপে দেখা যাক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ঠিক কী কী—

১) প্রকৃতি পরিবেশ অনুযায়ী ব্যাক্টেরিয়াগুলি তাদের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলছে (মূল চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা এখানে অপ্রয়োজনীয় বলেই আমার মনে হয়)।

২) ব্যাক্টেরিয়াগুলির জিনগত পরিবর্তন ও নতুন ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। এই প্রক্রিয়াটি ঘটছে বেশ দ্রুত গতিতে।

৩) অপর্যাপ্ত ও অপরিমিত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া। যা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ। শুধুমাত্র নিজের জন্যই নয় সমগ্র মানবজাতির জন্য। এই জায়গাটিতেই আমাদের ভূমিকাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পষ্ট। পরে তা নিয়ে আলোচনা করব। এবং সর্বোপরি,

৪) চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে চিকিৎসাজনিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যবহার। ইনটেনসিভ কেয়ার সেটআপ, ভেন্টিলেটর, ডায়ালিসিস, ক্যাথিটার ইত্যাদি জীবনদায়ী চিকিৎসা–সরঞ্জাম হলেও এইসব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে শরীরে সংক্রমণের পথ আরো সুগম হয়ে উঠছে। সুতরাং এইসব নানান কারণে জর্জরিত একটি বিপুল সমস্যার সম্মুখীন আমাদের ভবিষৎ। তারা ঘাপটি মেরে বসে থেকে সুযোগ খোঁজে, কখন মৃত জীবাণুগুলির থেকে জেনেটিক উপাদানগুলির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কখন নতুন ধরনের প্রজাতি সৃষ্টি করবে, তার আশায়। এভাবেই নতুন ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার সৃষ্টি হয়। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো কর্মক্ষম অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের হাতে নেই!

এখন ভাববার বিষয় যা, তা হল, এই যে এতসব অ্যান্টিবায়োটিক তাদের কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে, এর প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের কি কোনো দায়িত্ব আছে? আসুন, এর উত্তর খোঁজা যাক। যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করা যেতে পারে তা হল—

ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার শপথ নিতে হবে। সাধারণ সর্দি, কাশি, জ্বর, গা-হাত-পা ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা হলেই ওষুধের দোকানে গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক কেনা একেবারেই বন্ধ করতে হবে। ওষুধবিক্রেতারা এ ব্যাপারে যদি সতর্ক না হন তো হাজার প্রবন্ধ লিখেও কিস্যু হবে না। একহাতে তো তালি বাজে না! কোনো কোনো ডাক্তারবাবু রোগীর কিংবা তার আত্মীয়স্বজনের চাপে পড়ে ভাইরাসঘটিত রোগেও অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দেন। এরকম পরিস্থিতিতে ডাক্তারবাবুকে মাথা ঠান্ডা রেখে বোঝাতে হবে যে, অ্যান্টিবায়োটিক কতটা বিপদ ডেকে আনতে পারে, এমনকি এতে জীবনহানির আশঙ্কা পর্যন্ত হতে পারে। (যদিও একজন সাধারণ লোকের পক্ষে ডাক্তারবাবুকে বোঝাতে যাওয়া রীতিমতো বিপজ্জনক। অসম্ভবই বলা যায়। সম্পাঃ) বিগত বছরগুলোতে ডেঙ্গু ভাইরাসের যে বিচিত্র রূপ আমরা দেখেছি, তাতে আমিও বহু ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে বাধ্য হয়েছি। চিকিৎসক রুগীর আত্মবিশ্বাসের জায়গাটি আজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। রুগীর আত্মীয়দেরও বলব, ডাক্তারবাবুদের বিশ্বাস করুন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের চাপে রাখলে ফল খারাপ বই ভালো হয় না। যা আরো মারাত্মক তা হল, ঘনঘন এম্পিরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক পাল্টানো। দু দিনে এক ওষুধে কাজ হচ্ছে না বলে ওষুধ পাল্টে দেওয়া— আরো বিপজ্জনক। অপর্যাপ্ত ও অপরিমিত মাত্রায় ওষুধ ব্যবহার করলেও বেশ কিছু জীবাণু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। ফলে জিন বিনিময়ের ব্যাপারটি তরান্বিত হয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের ঘটনা বিংশ শতাব্দীর একটি গৌরবময় অধ্যায়। আগেই বলেছি যে, আলেক্সজান্ডার ফ্লেমিংয়ের পেনিসিলিন আবিষ্কারের হাত ধরে সেই পথচলা শুরু। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক– Sulfonamides, ephalosporins, Macrolides, Aminoglycosides, Quinolones, Glycopep-

tides ইত্যাদি। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের সেই গতিময়তা আর নেই। এর মানে এই নয় যে নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য গবেষণা থেমে আছে। উপরে আলোচিত জটিল জেনেটিক প্রক্রিয়ার প্রাদুর্ভাবই সম্ভবত ঠিক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পথে অন্তরায়। তাই আমাদের সকলকে শপথ নিতে হবে— রোগ প্রতিরোধের জন্য যাবতীয় কর্মযজ্ঞ একযোগে একজোট হয়ে শুরু করার দিন চলে এসেছে। যার প্রথম ধাপটি হল পরিষ্কার পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবহার; খাওয়াদাওয়ার আগে হাত পরিষ্কার কাজ থেকে শুরু করে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের অপপ্রয়োগ প্রতিরোধ করা। সঙ্গে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন অত্যন্ত জরুরি। পর্যাপ্ত ঘুম অত্যন্ত সুফলপ্রদায়ী। আমাদের শরীরে Circadian rhythm নিয়ন্ত্রণকারী রাসায়নিক বস্তুগুলির ভূমিকা এ ব্যাপারে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সে অন্য আরেক আলোচনার বিষয়। পরে অন্যত্র আলোচনা করা যাবে। ফাস্টফুড, জাঙ্কফুড, ওয়েস্টার্ন ডায়েট প্যাটার্ন, একেবারেই বর্জনীয়। ফাস্টফুড ও শপিংমলের প্যাকেটজাত খাবার খাদ্যনালীতে অবস্থানকারী বায়োটিকদের জন্য ভীষণভাবে হানিকর। এই ধরনের খাদ্যাভাসই আজ আমাদের দেশে স্থূলতা (ওবিসিটি), ডায়াবেটিস সহ হৃদরোগের প্রাদুর্ভাবের বড় কারণ। এই ধরনের আহারে খাদ্যনালীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে খাদ্যনালীতে বারংবার সংক্রমণ হয়। আর মানুষ মনে করে, পেটে ক্রনিক আমাশা হচ্ছে। তার জন্য দোকান থেকে কিনে কাঁড়ি কাঁড়ি অ্যান্টিবায়োটিক খেতে শুরু করে যা আবার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টান্সের একটা বড় কারণ। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, অসংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের পেছনেও সংক্রামক ব্যাধির ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ! হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিতে আরো পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। বিশেষত ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেটআপে যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশিকা (গাইডলাইন) তৈরি করতে হবে এবং তা করতে হবে দেশের অবস্থার কথা মাথায় রেখে। সেটা কোনও বিদেশি গাইডলাইন অনুসরণ করে না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং আমাদের আচার ব্যবহারের পরিবর্তনের মাধ্যমেই শুরু হতে পারে এক নতুন রোগ প্রতিরোধের অধ্যায়, যা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করতে আমাদের ঠিক পথটা দেখতে পারে।

উমা

এক শিক্ষিকার মৃত্যু

সুদেষ্ণা ঘোষ

রবি ঠাকুর লিখেছিলেন মূর্খ তোতাপাখির কথা 'তোতাকাহিনী'। তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থার জাঁতাকলে পিষে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের করুণ অবস্থা কবিগুরুর সংবেদনশীল মনকে নাড়া দিয়েছিল। সত্যিই তো ! শিক্ষার নিয়মানুবর্তিতার খাঁচায় বন্দি শিশুদের মন বিকশিত হওয়ার সুযোগ কোথায়! শুধু রাশি রাশি পুঁথির ভারে নুয়ে পড়া পড়ুয়াদের মনে কি শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে পারে? পারে না। তাই তাদের এই কারাগার থেকে মুক্তি দিতে খোলা আকাশের নীচে, প্রকৃতির কোলে কবিগুরু তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন। তা সে বেশ অনেকদিন আগেকার কথা। আজকের দিনে যদি কবিগুরু 'তোতাকাহিনী' লিখতেন, তবে কেমন হত সেই কাহিনী? কে হত খাঁচাবন্দি তোতাপাখি? কেই বা রাজা, কারাই বা পাখির শিক্ষক? ভাবনাগুলো মনের মধ্যে বেশ একটা ঝড় তুলল— খাঁচায় বন্দী পাখি তখন হাতে কলম ধরতে বাধ্য হল। হয়ত মৃত্যুর আগে সে নিজেই লিখে যেতে পারবে তার কাহিনী। আজকের তোতা ছাত্রছাত্রীরা নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকারা। গল্পের আগেই বলে রাখি, এখানে সব তোতাপাখির কথা নয়, আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলব, যা কবিগুরুর তোতাপাখির বন্দিদশার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিদিন তোতার মতো মৃত্যু হয় আমার মতো শিক্ষিকাদের। আচ্ছা শিক্ষিকারা কি জন্মান? না, একটি মানুষ জন্মে শিক্ষিকা হন? তা হলে শিক্ষিকাদের মৃত্যুর কথা বলা কি ঠিক? নাকি প্রতিদিন মৃত্যু হয়, বলাটা যৌক্তিক? মানুষ তো একবারই মারা যায়, বারবার মৃত্যু, এও কি সম্ভব? সে তো শেক্সপিয়ার বলেছিলেন, 'Cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once...', মানে আমরা, শিক্ষিকারা কাওয়ার্ড, ভীরু। স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো কী এমন কঠিন কাজ যে, তা নিয়ে কাঁদুনি গাইতে হবে? শিক্ষকতার মতো আরামের চাকরি আর আছে নাকি! সকলে তো এটাই ভাবেন। কিন্তু কেউ যদি আজকের দিনে নিষ্ঠার সঙ্গে, সততার সঙ্গে পড়াতে চেষ্টা করেন, তখনই বুঝবেন, কত ধানে কত চাল! খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি তা প্রায় ২২ বছর। প্রথমদিকে খাঁচাটি বড় ছিল, উড়তে পারতাম। এখন রবি ঠাকুরের তোতার মতো ডাকিও না, ডানাও ঝাপটাই না। আর গান গাওয়া? সে তো স্বপ্ন! না, নালিশ করছি না একেবারেই। নিজের ইচ্ছাতেই

তো শিক্ষিকা হয়েছিলাম। তাহলে সেই স্বাধীনচেতা মানুষটি আজ নিজেকে খাঁচায় বন্দী কেন ভাবছে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আজকের শিক্ষাব্যবস্থার গোলকধাঁধায় পাঠককে একবার ঢুকতে হবে। আজকাল ভাল পড়ানো, নিজের বিষয়কে ভালবাসা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেই ভালবাসা গড়ে তোলা, এসব ইতিহাস হয়ে গেছে। এসবের কোনও মূল্য নেই। আজকের দিনে শিক্ষিকা হতে হলে আপনাকে ছাত্রছাত্রীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে, ওদের বকুনি না দিয়ে ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, ওদের ভুলের দায়িত্ব নিতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক যদি বুঝে কিংবা না বুঝে ওদের ভুলপথে চালিত করেন, তার দায়িত্বও শিক্ষক-শিক্ষিকার! আপনি শিক্ষক বা শিক্ষিকা হলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করানোর দায়িত্বও আপনার; বিষয় যদি রসকষহীন হয়, তবে আপনি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে তাকে সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা গল্পে পরিণত করবেন কিংবা হ্যারি পটারের মতো রোমহর্ষক কাহিনীতে! না পারলে চলবে কেন! স্কুল থেকে আমরা বেতন পাই না! সবচেয়ে অদ্ভুত কথা, শিক্ষার প্রধান অঙ্গ নিজের কর্মের বা ভুলের দায়িত্ব নিজে নিতে পারা, এই শিক্ষাটাই বাকি থেকে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষিকারা সবার প্রশ্নের উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বাধ্য; সে স্কুলের মালিক, প্রধানশিক্ষিকা, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এমনকি তিনি স্কুল-অফিসের কর্মী হোন না কেন। এবং পড়াশোনা ছাড়াও ছাত্র বা ছাত্রীকে নাচে, গানে, আঁকায়, কুইজ, বিতর্কে, নাটকে, খেলাধুলায়— সবেতে পারদর্শী করে তোলার দায়িত্বও শিক্ষক বা শিক্ষিকার। সব স্কুলের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার আনা বাধ্যতামূলক! (নিন্দুকেরা বলে, অংশগ্রহণ করাটাই নাকি আসল লক্ষ্য, যত সব বাজে কথা!)

এসব না হয় হল। এছাড়াও আপিসের বড়বাবুর মতো কলম পিষে সব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখে ফাইলের পর ফাইল ভরতে হয় শিক্ষিকাদের। এসব নথিপত্র যে কোনো উচ্চ আদালতের মামলার কাগজপত্রকে হার মানাবে! এছাড়াও আপনি প্রতিমাসে কী পড়াবেন, পড়ানোর উদ্দেশ্য কী, ক্লাসে কী প্রশ্ন লেখাবেন, বাড়িতে কী কাজ দেবেন, যা পড়াবেন তার থেকে ছাত্রছাত্রীরা কী শিক্ষা পাবে, তা জীবনে কী কাজে লাগবে, ক্লাসে কী কী অ্যাক্টিভিটি করাবেন, কী প্রোজেক্ট করাবেন এবং ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হলে পুনশ্চ কীভাবে সেই সমস্যার সমাধান করবেন, এইসব লিখে রাখতে হবে 'লেসন প্ল্যান' খাতায়। আমরা পরের মাসে কী পড়াব তার প্ল্যান করছি, না তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি!

এরপরে আসুন ভুলভুলাইয়ার গভীরে। যদি আপনার স্কুল গ্লোবাল বা ওয়ার্ল্ড স্কুল হয়। শহরের পাঁচতারা হোটেলের মতো ঝকঝকে স্কুলে পড়ালে আপনাকে বিদেশের কোনো স্কুলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। অন্য দেশের শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী এদেশে আসবেন এবং পরে আপনার স্কুলের পড়ুয়ারাও বিদেশে যাবেন, হয়ত আপনিও। ওই ১০ দিনের মধ্যে কালচারাল এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অন্য দেশটিকে চিনবে, জানবে। এই অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির জন্য খরচও কম নয়। তবে বিদেশে যাওয়ার টানও তো নেহাত কম নয়! আমাদের ছাত্রছাত্রীরা নাই বা জানল নিজেদের দেশের সংস্কার-পরম্পরা, নাই বা শিখল আপন দেশকে ভালবাসতে, তার পুরাতন-সনাতনী রীতি রেওয়াজকে শ্রদ্ধা করতে। গ্লোবাল সিটিজেন হতে পারলেই তো কেল্লা ফতে! এখানেই শেষ নয়। শিক্ষিকাদের পাঠানো কর্মশালায় যেখানে অনাবশ্যক আলোচনা করা হয় (এগুলির জন্য ব্যয়ও প্রচুর এবং ব্যবসার দিক থেকে এগুলি অতি-আবশ্যক!) এগুলিরও রিপোর্ট দিতে হয় শিক্ষিকাদের, মাঝে মাঝে মনে হয়, এত লিখতে লিখতে একদিন শিক্ষক-শিক্ষিকারা লেখক-লেখিকায় পরিণত হবেন না তো!

এছাড়াও আছে ছবি তোলা। সব কিছুর প্রমাণ চাই তো! তাই ছবি, প্রচুর ছবি, প্রচুর লেখা সবকিছু একত্র করে পাঠাতে পারলে আবার পুরস্কার পাবে স্কুল! তারপরে খবরের কাগজে ছবি, খবর, সাক্ষাৎকার আরো কত কি!

পাঠক যদি ক্লান্ত না হয়ে থাকেন তবে আসুন, আরো কিছু গোলকধাঁধার পথে ঘুরি। এবারে মিটিংয়ে। কথাটা কলকাতায় খুবই জনপ্রিয় রাজনীতি মহলে। কিন্তু স্কুলে? আছে, আছে। মিটিংয়ে ভরা জীবন। প্রধানশিক্ষিকার সঙ্গে, কোঅর্ডিনেটরদের সঙ্গে, জুনিয়র, মিডল, সিনিয়র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে— প্রচুর নতুন কথা শোনা যায়, শেখা যায়।

উচ্চমার্গের প্রশ্ন (Higher order thinking skills or HOTS), entry এবং exit level competencies, শেখার ফলাফল (Learning Outcomes), লক্ষ্য (targets), আচরণবিধি ইত্যাদি। প্রচুর পাতা টাইপ করা হবে, ছাপা হবে, আঠা দিয়ে যত্ন সহকারে খাতায় সাঁটিয়ে রাখা হবে (নিন্দুকেরা বলবে 'পাতা নষ্ট করা হচ্ছে'- তা বলুক গে!), এসব মিটিংয়ে মূল বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হয় না। তবে আপনি কি ভেবেছেন শিক্ষিকা পড়াশোনা না করে ছাড় পাবেন? একেবারেই না। তোতা কাহিনীর পাখির মতো শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলের গ্রন্থাগারে যেতে হবে ব্রাউজিং করতে। এই ধরুন, বছরে দুবার, ঘণ্টাখানেক ধরে; ব্রাউজিং মানে চোখ বোলানো। আপনি শিখুন বা না শিখুন, সই করে রেকর্ড করা হবে তোতাপাখির শিক্ষা এগোচ্ছে! এরপরে আসল কাজ, খাতাদেখা। এটা তো আছেই। ক্লাসের কাজ, বাড়ির কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট, অ্যাসেসমেন্ট, ওয়র্কশিট... কত নামে ডাকা হয় ওসব কাজকে। সেসব বাড়ি

বাকি অংশ ২৩ পাতায়

বাবা রামদেবের আধ্যাত্মিক সুড়সুড়ি বাজার দখল করল পতঞ্জলির পণ্য

ভবানীপ্রসাদ সাহু

ভারতে বেশ কিছু বিত্তবান ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান বাবাজি-গুরুজির জন্ম হয়েছে। কিছু ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক কথাবার্তা অতি সরল করে কিংবা গুরুগম্ভীর করে বলা, আপাত-নৈতিকতার কিছু বাণী বিতরণ, অলৌকিক ক্ষমতার নাম করে কিছু ম্যাজিক দেখানো, ভক্তদের দেওয়া দান-অনুদানের টাকায় কিছু সেবামূলক কাজকর্ম, সমাজের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রচারমাধ্যমের লোকজন কিংবা রাজনৈতিক নেতাকে 'ভক্ত' বানিয়ে ফেলা ইত্যাদি নানা উপায়ে তারা সরলবিশ্বাসী অসংখ্য মানুষের ভক্তি-আনুগত্য অর্জন করতে সফল হয়েছে।

সফল ঐ সব ধর্মব্যবসায়ীদের পর আধুনিক ভারত পেয়েছে আরেক বাবাজিকে— বাবা রামদেব, যে চরিত্রগতভাবে ঐসব তথাকথিত ধর্মগুরুদের থেকে বেশ কিছু দিক থেকে আলাদা। যোগব্যায়াম ও আয়ুর্বেদের খিচুড়ি বানিয়ে তাকে ভারতের ঐতিহ্য হিসেবে এবং হিন্দুত্ববাদ ও জাতীয়তাবাদ (দেশভক্তি!) এই দুইয়ের সরবৎ বানিয়ে তাকে অবশ্যগ্রহণীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কাজ সে সফলভাবে করে চলেছে। আর সঙ্গে আছে এসব ভাঙিয়ে কোটি কোটি টাকার লাভজনক ব্যবসা, যা বহুজাতিক বিদেশি কোম্পানিদেরও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে এবং যাকে ভারতের স্বনির্ভরতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পাশাপাশি জনসেবারও কাজ হিসেবে সফল প্রচার করে বহু ভারতীয়র অকুণ্ঠ সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তার এই সাফল্য ও সক্ষমতার ভিন্ন তাৎপর্য ও দূরপ্রসারী বিপদ যাই হোক না কেন, তার নিজের ও তার প্রচারিত ব্যবসায়িক পণ্যের বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করার পেছনে বাবা রামদেবের ক্ষুরধার বুদ্ধি, সময়োপযোগী কৌশল অবলম্বনের দক্ষতা ইত্যাদি অবশ্যই সম্ভ্রম পাওয়ার যোগ্য। আর এইভাবেই স্বদেশের অন্যান্য কিছু গুরুজি, বাবাজি বা ধর্মব্যবসায়ীদের থেকে তাকে পৃথক আসনে বসাতে হয়। আর ঠিক এই কারণেই তার চর্চা করা ও তাকে নিয়ে আলোচনার জন্য দেশবিদেশের অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এমনই একজন হলেন আমেরিকার সাংবাদিক বেন ক্রেয়ার। ইনি বাবা রামদেবের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তার জীবন, কাজকর্ম ও ব্যবসা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ঐসবের ওপর ভিত্তি করে বেন ক্রেয়ার যে ইন্টারনেট প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন (১৫ মার্চ ২০১৮) মূলত সেটির কিছু তথ্য ও মন্তব্য নিয়েই বাবা রামদেব সম্পর্কে এই আলোচনাটি।

বাবা রামদেব এখন ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত কয়েকজনের অন্যতম হলেও তার ঠিক জন্মতারিখ বা সাল জানা নেই। বর্তমানে তার বয়স আনুমানিক বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি। ১৯৯০-এর সময়কালে উত্তর ভারতের এক ধর্মীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল সে। পরে শিক্ষকও হয়। কিন্তু তার এক স্বীকৃত জীবনী অনুযায়ী, ওই সময় এক ছাত্রকে নৃশংসভাবে মারধর করার মনস্তাপে সে এই পেশা ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর হরিদ্বারে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় পুরনো সহপাঠী বালকৃষ্ণের। বালকৃষ্ণ যোগগুরু করমবীর মহারাজের ঘনিষ্ঠ ছিল। এই যোগগুরু রামদেবকেও শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু শর্ত দেন, যোগশিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনই কোনোভাবে পয়সাকড়ি নেওয়া যাবে না এবং নিজেকে বিরাট করে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করাও যাবে না। এই তিনজন এরপর হিমালয়ের গুহায় কিছুদিন তপস্যা, ধ্যান ইত্যাদি করে। ১৯৯৫ সালে ফিরে এসে হরিদ্বারের একটি আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করার পর বালকৃষ্ণ সেটির আয়ুর্বেদ ঔষধালয়টি চালাতে থাকে এবং রামদেবকে সঙ্গে নিয়ে করমবীর মহারাজ যোগশিক্ষা দিতে থাকে। ঐ সময় পাশ্চাত্যে এবং কিছু শিক্ষিত মহলে যোগ (ইয়োগা!) ক্রমশ কল্কে পাচ্ছিল, কিন্তু এদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রসার ছিল না। বিশেষত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের মধ্যে এমন একটা ধারণা ছিল যে, ঐ সব 'যোগা' বা 'ইয়োগা' বড়লোক আর অভিজাতদের ব্যাপারস্যাপার। রামদেবসহ করমবীর মহারাজ সাধারণ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যের যোগশিক্ষার অনেক কর্মসূচি নিল। ঐ সময় রামদেব দর্শকদের চমক দেওয়ার জন্য বিশেষ কিছু কায়দা শিখে নেয়। যেমন, মাথায় ভর দিয়ে অনেকক্ষণ সোজা 'দাঁড়িয়ে' থাকা, পেটের মাংসকে দলা দলা করে পাকানো, শ্বাস নিয়ে পেট কুঁচকে মাংস পেশীকে নাভির কাছে দলা পাকানো,

তারপর ঢেউয়ের মতো চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। একদিকে সে যোগব্যায়ামের সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পর্ক টানল, অন্যদিকে এটিকে সহজ-সরল করে তুলল, যাতে যে কোনো মানুষ অনায়াসে বা অল্প আয়াসে তা করতে পারে। যোগ-এর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধ্যান বা মন্ত্র (সূত্র) শেখা ও পড়ার ব্যাপারস্যাপার বাদ দিয়ে দিল, পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমা করতে থাকল, যেগুলির সাহায্যে নানা রোগ নিরাময় হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— হৃদরোগ, স্থূলতা ও ডায়াবিটিস। তার যোগব্যায়াম ছিল আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে শরীরকে রোগমুক্ত চিকিৎসাও। স্পষ্টতই এর ফলে ভারতের মতো দুর্বল স্বাস্থ্য পরিষেবার দেশে এবং সংখ্যাগুরু ধর্মবিশ্বাসী মানুষের দেশে, রামদেবের যোগব্যায়াম দ্রুত জনপ্রিয় হতে থাকল। এটিকে কাজে লাগিয়ে রামদেব নিজের প্রচারের জন্য উন্মুখ ছিল। ২০০২ সালে একটি ধর্মীয় টিভি চ্যানেল নতুন যোগ অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে। রামদেব তাতে পরীক্ষা (অডিশন) দেয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রযোজকেরা তাকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। দূরদর্শনে মুখ দেখানোর জন্য মরিয়া রামদেব এতে দমে না গিয়ে অন্য একটি প্রতিযোগী চ্যানেলের ২০ মিনিটের সময় (স্লট) কিনে নেয় এবং সকালবেলার মোক্ষম সময়ে টিভিতে যোগব্যায়াম দেখাতে থাকে, সঙ্গে ঐ বুকনি— আধ্যাত্মিকতা, ভারতীয় ঐতিহ্য আর নানা রোগব্যাধি সারানোর নিদান। শুধু স্থূলতা, ডায়াবিটিস, হৃদরোগ নয়, যোগব্যায়ামের সাহায্যে এইডস, সমকামিতা এবং ক্যান্সার সারিয়ে দেওয়ার দাবিও করে বসল। তার কাছে সমকামিতাও একটি রোগ বা অসুস্থতা। অথচ সমকামিতা মানুষের আবেগের অন্যতম সুস্থ একটি বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, যদিও তা তুলনায় কম জনের ক্ষেত্রে ঘটে। সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্টও এর মান্যতা দিয়েছে। তার এইসব চমকপ্রদ কথাবার্তা আর পেট নাচানোর মতো কায়দাকানুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। ঐ সময় থেকে ২০১৭-র মধ্যে ভারতের ঘরে ঘরে টিভির সংখ্যা কয়েকগুণ যেমন বেড়েছে, তেমনি তার লক্ষ লক্ষ সাধারণ দর্শক (স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কিছুটা ধর্মবিশ্বাসী ও ঐতিহ্যপ্রেমিক, সর্বোন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ না পাওয়া) বাড়িতে বসে বিনা খরচে যোগচর্চা করতে বা অন্তত তা দেখতে শুরু করল। শুধু আত্মপ্রচার নয়, আর্থিক লালসাও তার কম ছিল না। যোগগুরু করমবীর মহারাজ তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করার সময় অর্থের বিনিময়ে যোগশিক্ষা না দেওয়ার যে শর্ত দিয়েছিলেন, রামদেব তা ভাঙতে শুরু করল। যোগের ক্লাসে মঞ্চের সামনের দিকে বসার সুযোগ দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ দাবি করা শুরু করল। ভক্তি মেহতা নামে টিভির এক আধিকারিক ২০০৬ সালে লন্ডনে যোগশিক্ষার এক কর্মসূচিতে রামদেবের সঙ্গী ছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, বাড়িতে গিয়ে যোগ শেখানোর জন্য রামদেব ২০,০০০ ডলার নিত। আর যোগশিক্ষার সময় সে একটি কাপড়ের উপর দাঁড়াত। দর্শকেরা তার পায়ের কাছে টাকা (পাউন্ড) ফেলত। রামদেব ঐ সুদ্ধু কাপড়টি গুটিয়ে নিত। এসব দেখে করমবীর মহারাজ রামদেবের সঙ্গ তথা হরিদ্বারের ঐ আশ্রম ত্যাগ করেন।

যোগব্যায়ামের পাশাপাশি অর্থকরী অন্য ব্যবসার দিকেও সে ঝুঁকতে থাকে। যোগকে ভারতের ঐতিহ্য, দেশভক্তি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত হিসেবে প্রচার করেছিল। একবার সে বলেওছিল, যোগ-ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয়ের সংযুক্ত থাকা পরোক্ষভাবে দেশভক্তি ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতো ব্যক্তির প্রসঙ্গ তুলে বলতে থাকে, গান্ধী বলেছিলেন স্বাধীনতার পূর্ব শর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, রামদেব সঙ্গে আরো যোগ করে, স্বাধীনতার অর্থ শুধু ব্রিটিশদের অধীনতা থেকে মুক্তি নয়, অস্বাস্থ্যকর পদার্থ থেকেও মুক্তি। নানা বক্তৃতায়, ক্লাসে, দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে সে বারবার বলে যে, বিদেশি কোনো জিনিস বা পণ্য আসলে বিষ এবং সেগুলিই হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর। এইসব পণ্যের দ্বারা ভারতীয় জনমানস বিভ্রান্ত; দেশের 'ঐতিহ্যমণ্ডিত বিজ্ঞানের' সাহায্যে ও আমাদের পূর্বসূরী মুনিঋষিদের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় পণ্য তৈরি করতে হবে, এই ছিল তার প্রচার। এবং তা পাবলিক খেলও ভাল।

শুরু হল পতঞ্জলির ব্যবসা। (উল্লেখ্য যে, পতঞ্জলি নামে প্রাচীন ভারতের এই অসাধারণ ব্যক্তি যিনি যোগ-এর কথা বলেছিলেন। তার অনেক ধাপ ও নানা দিক ছিল। ধ্যান থেকে মোক্ষ, অনেক কিছুই, শারীরিক ব্যায়াম তার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। রামদেব সুকৌশলে 'যোগ' ও 'পতঞ্জলি' শব্দগুলি ব্যবহার করেছে। কিন্তু রামদেবের 'যোগ' বা ঐ তথাকথিত 'যোগা', 'ইয়োগা' ইত্যাদির সঙ্গে পতঞ্জলির যোগের মিল খুবই নগণ্য। এই অর্থে পতঞ্জলির দেওয়া 'যোগ' কথাটির বিকৃতিই ঘটানো হয়েছে।) তথাকথিত আয়ুর্বেদের নাম করে নানা গাছগাছড়া ও গেরস্থালির অজস্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একের পর এক তৈরি হতে থাকল। হরিদ্বারের তথাকথিত ঐ আশ্রমের একটি অংশে ছিল এসব বানানোর কারখানা। বালকৃষ্ণ ছিল ঐসব পণ্য সহ আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়ের দায়িত্বে। ঐসব পণ্য বিপণনের এক সুন্দর কৌশলও শুরুতে নেওয়া হয়েছিল। বেশ কয়েকজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসককে নিয়োগ করেছিল তারা। রামদেবের যোগশিক্ষার ক্লাসে তাঁরা গিয়ে বিনা পয়সা রোগী দেখতেন এবং প্রেসক্রিপশন লিখতেন। কিন্তু ওষুধগুলি কিনতে হত। পাশাপাশি বিক্রি হত অন্যান্য জিনিসপত্র। দূরদর্শন মারফত রামদেবের মুখ জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ পরিচিত হওয়ার সঙ্গে তাল রেখে বিক্রি বাড়তে থাকল এইসব ওষুধ ও পণ্যের। শুরুর ঐ সময়ে রামদেব ও বালকৃষ্ণ বাইক-এ চেপে মাঠে ও জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওষধি গাছগাছড়া সংগ্রহ করতে। অর্থাৎ সত্যিই প্রশংসনীয়

পরিশ্রম করত। আর তার ব্যবসায়িক সুফলও পাওয়া গেল। ২০০৫ সালেই বালকৃষ্ণ এত টাকাপয়সা লেনদেন করছিল যে, দেশের আয়কর দপ্তরের নজরে পড়ে যায়। এই বিভাগের অফিসারেরা আশ্রমের কারখানায় ও বালকৃষ্ণের দপ্তরে হানা দেয়। কিন্তু জিতেন্দর রানা নামে আয়কর দপ্তরের এক স্থানীয় আধিকারিক রামদেবের জীবনী লেখার জন্য নিয়োজিত প্রিয়াঙ্কা পাঠক নারায়ণকে জানিয়েছিলেন, উপর মহল থেকে এই হানাদারি বন্ধ করার নির্দেশ আসে। ফলে আর কিছুই হয় নি।

রামদেব দাবি করে যে, সে পতঞ্জলির কোনো আধিকারিক নয়, প্রধান তো নয়ই। একজন গুরু যেভাবে আশ্রম চালান– ঐভাবেই সেও পতঞ্জলির সঙ্গে যুক্ত। তার মতে এটি কোনো কর্পোরেট হাউস নয়, মূলত এটি একটি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক কাজ। ভারতীয় ঐতিহ্যে গুরু হচ্ছেন প্রশ্নের অতীত, অতীব শ্রদ্ধেয় ও শিষ্যদের কাছে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারি এক ব্যক্তিত্ব। রামদেবও ঐভাবেই পতঞ্জলির কর্মী তথা দেশবাসীর কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এ দেশের বহু মানুষ এই মানসিকতা পোষণও করে, এ সব কথাবার্তা বিনা প্রশ্নে মেনেও নেয়। এইভাবে রামদেব হয়ে গেছে বাবা রামদেব। সে কর্মচারিদের

২০০৫ সালেই পতঞ্জলির ৪০০ কর্মচারির প্রায় এক–চতুর্থাংশ ন্যূনতম মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করেন (অর্থাৎ তাদের এ দেশের আইন অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরিও দেওয়া হয় না!), তাঁরা এও ফাঁস করে দেন যে অনেক অননুমোদিত উপাদান দিয়ে পতঞ্জলির ওষুধ ও পণ্য বানানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের খুলির হাড়ের গুঁড়ো, ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় অনেক পণ্যে মানুষের ডিএনএ-ও পাওয়া গেছে বলে তাঁরা জানান।

মাংস খাওয়া ও মদ্যপান না করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাদের বলা হয়, তারা একটি সেবাকর্মের জন্য শ্রম দিচ্ছে, আধ্যাত্মিক পরিষেবা দিচ্ছে। তাই এর ফলে প্রাপ্য মজুরির কম পারিশ্রমিক তারা নেবে, এটিই প্রত্যাশিত। অনেকে তা বিনা প্রশ্নে মেনেও নেয়, দেখা হলেই রামদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। কিন্তু পেটের দায় বড় দায়। সবাই তা মানতে পারে না। ২০০৫ সালেই পতঞ্জলির ৪০০ কর্মচারির প্রায় এক–চতুর্থাংশ ন্যূনতম মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করেন (অর্থাৎ তাদের এ দেশের আইন অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরিও দেওয়া হয় না!), তাঁরা এও ফাঁস করে দেন যে অনেক অননুমোদিত উপাদান দিয়ে পতঞ্জলির ওষুধ ও পণ্য বানানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের খুলির হাড়ের গুঁড়ো, ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় অনেক পণ্যে মানুষের ডিএনএ-ও পাওয়া গেছে বলে তাঁরা জানান। (ঐ সময় এক বামপন্থী নেত্রীও এ ব্যাপারে সরব হয়েছিলেন এবং তখনকার সংবাদপত্রে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।) কিন্তু রামদেব-বালকৃষ্ণ এবং তাদের প্রশ্রয়দাতা রাজনৈতিক কিছু ব্যক্তি— সবাই মিলে এই ধর্মঘট এবং ধর্মঘটীদের দাবিগুলি শেষ করতে ও নস্যাৎ করতে সমর্থ হয়। পতঞ্জলির কিছু পণ্যে মানুষের ডিএনএ পাওয়া গেছে বলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার রিপোর্টকে রামদেব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিবৃত বলে উড়িয়ে দেয়। তার নাম যোগ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। এরই সুযোগ নিয়ে সে বলে, এ সব আসলে এক কায়েমি স্বার্থের চক্রান্ত, যারা ভারতের ঐতিহ্য ও ভারতের গৌরব যে প্রাচীন বিজ্ঞান, তার বিরোধী; এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। অনেক রাজনৈতিক নেতা তার সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধর্মঘটীদের মুচলেকা দিতে বাধ্য করা হয়— তাঁরা আয়ুর্বেদ ও যোগের বিরুদ্ধে কোনো প্রচার করেন নি, করবেন না।

ল্যাবরেটরিতে পুনরায় পরীক্ষার রিপোর্টেই ঐ সব পণ্য থেকে মানুষের ডিএনএ সহ অন্যান্য কিছু অনুমোদনহীন উপাদান উড়ে যায়। ওই ওড়ার পেছনে কারণ যাই থাক এবং রামদেব পতঞ্জলির সব পণ্যকে পবিত্র নিখুঁত নির্দোষ দাবি করলেও, নানা মহল থেকে এই পবিত্রতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এগুলি স্বল্পপ্রচারিত। পতঞ্জলির বিপুল বিজ্ঞাপনে এসব চাপা পড়ে গেছে। যেমন ভারতের সামরিক বিভাগের পক্ষ থেকে পতঞ্জলির একটি পানীয় (জুস) জওয়ানদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়, কারণ সেটি ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি। হিন্দুস্তান টাইমস তার পরের মাসেই জানিয়েছিল, পতঞ্জলির স্বাস্থ্যকর হিসেবে প্রচারিত 'শিবলিংবীজ'ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি।

নেপালে পতঞ্জলির ছয়টি পণ্য নিষিদ্ধ করা হয়, কারণ সেগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল। গরুর প্রস্রাব থেকে বানানো ঘর মোছার 'সাবান' থেকে শুরু করে লবঙ্গ–নিম ইত্যাদি ১৩টি গাছগাছড়া মিশিয়ে দাঁতের মাজন, এমন অজস্র পণ্য নিয়ে এখন পতঞ্জলির আয়ুর্বেদের ওষুধের সঙ্গে চাল, নুন, ঘি, আটা, মসলা, মধু, সাবান, তেল ইত্যাদি ইত্যাদি। সবেতেই ঐ দেশীয় ঐতিহ্য, আয়ুর্বেদ ইত্যাদির ছোঁয়া এবং নিরাপদ, প্রাকৃতিক হিসেবে প্রচারিত। এমনকি গরুর প্রস্রাব থেকে বানানো ঘর মোছার 'সাবানকে', গোমাতাকে বাঁচানোর যুক্তি হিসেবেও প্রচার করা হচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়াচ্ছে, এখনকার হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথা বলা শাসকগোষ্ঠীর লোকজনের মদতে। একসময় হয়ত এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে পতঞ্জলির জিনিস না কিনে অন্য কোম্পানির, বিশেষত বহুজাতিক কোম্পানির পণ্য কিনলে

ক্রেতাকে দেশবিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী, ঐতিহ্যবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, তার দেশভক্তি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হবে, তার জন্য মারধর খেতে হবে, গণপিটুনিতে মরতে হবে বা জেলে যেতে হবে। পতঞ্জলির চাপে ব্যবসা রাখতে এখন কলগেট, পামোলিভ বাধ্য হয়ে তাদের টুথপেস্টে নিম ইত্যাদি মিশিয়ে সেটিকে এ দেশের আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে প্রচার করছে। হিন্দুস্থান লিভার তাদের 'ব্রণের মলমে' হলুদ মিশিয়েছে। ২০১৫ সালে হঠাৎ নেসল-র ম্যাগিতে সীসা আছে বলে দেশ তোলপাড় হল। ম্যাগি বাজার থেকে প্রায় উধাও। সঙ্গে সঙ্গে পতঞ্জলি ঐ ধরনের চটজলদি (ইন্সট্যান্ট) ম্যাগি বানিয়ে বাজারে নেমে পড়ল। রামদেব এটিকে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বললেও দেশের খাদ্যনিরাপত্তা দপ্তর (ফুড সেফটি অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অভ ইন্ডিয়া) পরীক্ষা করে জানাল এতে নিরাপদ, আইনানুগ মাত্রার তিনগুণ বেশি ছাই (অ্যাশ) আছে। কিন্তু তাতে রামদেব তথা পতঞ্জলি-ভক্ত ক্রেতাদের কিছু এসে যায় না। রামদেব যাই বানায় তাই নিরাপদ, দেশজ বিজ্ঞানসম্মত!এই ধরনের প্রখর ব্যবসায়িক বুদ্ধির সাহায্যে সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক পরা বাবা রামদেবের পতঞ্জলি কয়েক বছরে তাদের ব্যবসা বিপুল বাড়াতে পেরেছে। ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে তার ব্যবসা চারগুণ বেড়ে ১৮.৮ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে, আর ২০১৭-তে প্রায় কুড়িগুণ বেড়ে হয়েছে ১৬০ কোটি ডলার। তাদের পণ্যের সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে ৫০০ হয়েছে। ২০১৭ সালে তাদের ব্যবসা এই প্রথম একশো কোটি (এক বিলিয়ন) ডলার ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে পতঞ্জলির ডিরেক্টর বা অন্য কোনো পদাধিকারি কিংবা শেয়ার হোল্ডার হিসেবে সরকারিভাবে রামদেবের নাম কোথাও নেই! 'সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী'র ভাবমূর্তি সে ধরে রাখতে পেরেছে এবং এটিও পতঞ্জলির ব্যবসার বড় মূলধন। আচার্য বালকৃষ্ণই হচ্ছে পতঞ্জলির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অন্তত তার নিজস্ব ওয়েবসাইট অনুযায়ী। কোম্পানির শতকরা ৯৮.৬ ভাগ শেয়ারই এই বালকৃষ্ণের নামে। ফোর্বস-এর হিসেব অনুযায়ী সে এখন এ দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ১৯তম, তার সম্পদের মোট পরিমাণ ৬১০ কোটি ডলার! রামদেব পতঞ্জলির 'ব্র্যান্ড অ্যামবাসাডার'। দোকানে, বিজ্ঞাপনে, দূরদর্শনে সর্বত্র তার ছবি দেখিয়েই ব্যবসা করা হয়।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

ভুল, দুঃখিত

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যার সূচিপত্রে 'সঞ্জয় ও দিব্যদৃষ্টি' শীর্ষক লেখাটি রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের। অনবধানে সেটি আশীষ লাহিড়ীর বলে ছাপা হয়েছে। এছাড়াও ভবানীপ্রসাদ সাহুর লেখা 'জ্যোতিষকে কুসংস্কারবিরোধী আইনের বাইরে রাখা মূর্খামি, নয়ত দ্বিচারিতা' শীর্ষক লেখার ২৬ নং পাতার প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের উদ্ধৃতির শেষে সংক্ষেপিত-র স্থানে সংশোধিত ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।— সম্পাদক

এক শিক্ষিকার মৃত্যু

১৯ পাতার পর

নিয়ে গিয়ে, পরিবারের মানুষকে তোয়াক্কা না করে, রাত জেগে খাতা দেখা চলে। কোনো ওভারটাইম নেই (এটাও নিন্দুকেরা বলে!)। শিক্ষাদান মহান কাজ, তার আবার ওভারটাইম কি!এছাড়াও একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় শিক্ষকতার ব্যাপারে— প্রচুর ছুটি আমাদের। ঠিকই তো। এর পরেও ওঁরা ছুটি নেন কীভাবে! এত ছুটি, রোগ, জ্বরজ্বালা, পড়ে-যাওয়া, হাত-পা ভাঙা, পরিবারের মানুষজনের অসুস্থতা- সবকিছুই ছুটির মধ্যে হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর বিধাতা বলে কেউ থাকলে তিনিই দিতে পারতেন! প্রতিদিন কাজের ভারে মারা যায় শিক্ষিকার ভেতরের মানুষটি। প্রতিদিন সকালে আবার জন্ম নিয়ে নতুন উদ্যমে স্কুলে যাই। প্রতিদিন মারা যাই, যখন আমাদের বলা হয় 'কাজ ভাল করছেন না', ছাত্রছাত্রীদের অক্ষমতা নিয়ে দোষারোপ করা হয়, আমাদের দিকে ঘৃণার সঙ্গে আঙুল তুলে দেশের কোনো বিকৃতমস্তিষ্ক শিক্ষকের বা শিক্ষিকার বর্বর আচরণের তুলনা টেনে নিন্দা করা হয়। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুবরণ করি যখন, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারে না।

হঠাৎ তোতাপাখির মতো খাঁচার মধ্যে ছটফট করতে করতে থমকে গেছি। মনে হচ্ছে, জীবনের একটা বড় শিক্ষা বোধহয় পাই নি- কীভাবে উদাসীন থাকতে হয়। উদাসীন হতে পারলেই মোক্ষপ্রাপ্তি। পারি নি তাই জীবন-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি নেই। তাই আমরা শেক্সপিয়রের কাপুরুষের মতো বহুবার মৃত্যুবরণ করি, কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই না।

আমরা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখাই, অথচ নিজেরা মুখ বুজে অন্যায় সহ্য করি, কি আপাত-বৈপরীত্য না! শিক্ষাব্যবস্থার এই অবক্ষয় দেখে ভয় হয়, একদিন আমাদের সমাজ বহু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে হারাবে, যাঁরা সত্যিকারের জীবনযুদ্ধে লড়ার শিক্ষাদান করেন, ভালবেসে জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলি বিলিয়ে দেন। তোতাকাহিনীর তোতাপাখির মতো এই শিক্ষিকাও মৃত্যুবরণ করবেন এবং পরের দিন তার আর পুনর্জন্ম হবে না!

উমা

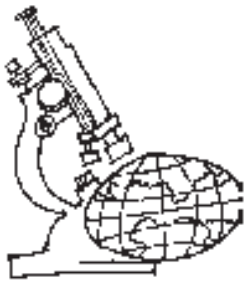

বালুকাবেলায় লিখেছিনু

সমীরকুমার ঘোষ

নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, ‘তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?’ নদী উত্তর করিত, ‘মহাদেবের জটা হইতে।’ জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছিলেন তাঁর এক অনবদ্য রচনায়— ‘ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে’। এই প্রশ্নের খেই ধরে কেউ যদি তটভূমিতে গিয়ে বালির কাছে জানতে চায়, ‘বালি তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?’ বালিও প্রায় একই উত্তর দিতে পারে, ‘মহাদেবের জটা হইতে।’ এই মহাদেবের জটা আসলে পাহাড়, আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে পাথর।

আমরা পুরী বা দীঘায় গেলেই দেখি সমুদ্রপার থইথই করছে বালিতে। চারিদিকে রাশি রাশি। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এত বালি এখানে এল কোথা থেকে! এসেছে সেই মহাদেবের জটা থেকে। নিরন্তর বয়ে আনছে নদী। ফেলছে সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চলে। মহীসোপান ইংরেজিতে ‘কন্টিনেন্টাল সেল্‌ফ’। পাড় ধরে সমুদ্রের ভেতর অনেকটা নেমে যায়। এছাড়া ঢেউয়ের ধাক্কায় তটদেশের পাথরও ভেঙে বালির দল ভারী করে। নদীর পাড়েও বালির বাসা। রামায়ণে রামচন্দ্রের সহায়তায় সুগ্রীব বালিকে হত্যা করেছিল। এ যুগেও সেই মডেল মেনে এন্তার তুলে আনছি, ঘরবাড়ি বানাচ্ছি। তাতে যে নদীখাত বদলে যাচ্ছে, বিপদ বাড়ছে, কে তার তোয়াক্কা করে!

এত ঠিকুজি-কোষ্ঠী না জানলেও বালি আমাদের প্রিয় বিষয়। শব্দটা সংস্কৃত। অনেকে আদর করে ডাকে বালু, বালুআ, বালুকা, বালিকা, বেলে। বালি দিয়ে জায়গার নাম রেখেছি। বালিয়াড়িকে কত মধুর নামে ডাকি— বেলাভূমি, সৈকত, বালুচর, সাগরবেলা ইত্যাদি। শুধু চোখেই নয় গল্পে, গানেও উড়ে এসে জুড়ে বসে। ‘কী আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে’, ‘বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু’, ‘সাগরবেলায় ঝিনুক খোঁটার কালে গান গেয়ে পরিচয়’— স্মৃতি হাতড়ালে এমন অনেক গানের হদিশ মিলবে। ‘নির্জন সৈকতে’ নিয়ে তপন সিংহ তৈরি করেছেন চমৎকার এক ছবি। ‘চোখের বালি’, ‘সে গুড়ে বালি’, ‘বালির বাঁধ’ ইত্যাদি বাগধারায় অবশ্য বালির ভাবমূর্তি খুব একটা উজ্জ্বল নয়। বেতালের বইতে কিলাউইয়ের সোনাবেলার কথা অনেকেই পড়েছেন। সেখানে বালির সঙ্গে থাকে সোনা। তবে বালি ছেঁচে সেই সোনা নেওয়া বা গড়াগড়ি দেওয়া, কোনোটারই উপায় নেই। কারণ ওটা বেতাল ও ডায়না স্পেশাল। সাধারণের অগম্য। তাই গোয়ায় এসে সাহেবরা বালিতে গড়াগড়ি খায়। তা দেখে আমোদ পেতে লোকে ওখানে যাওয়ার জন্য আঁকুপাকু করে। সে যারা করে করুক, আমরা বালির অন্দরমহলে ঢুকি।

পৃথিবীতে পাহাড় কীভাবে সৃষ্টি হল সে ব্যাখ্যায় যাব না। অতদূর পিছলে বালিয়াড়িতে ফিরতে বিস্তর শব্দ খরচ হবে। পাহাড়, নদী তৈরি হয়েছে পর্ব থেকেই বালির উৎস খোঁজা শুরু করা যাক। পাহাড় উদোম পড়ে থাকে। অভিভাবক হীন। বেওয়ারিশ। সেই কবে একবার বিন্ধ্যাচল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সূর্যের রথকে রুখে দিয়েছিল। পৃথিবী যাচ্ছিল রসাতলে। অগস্ত্য মুনি কৌশল করে সে যাত্রায় উদ্ধার করেন। মাথা নুইয়ে প্রণাম করা বিন্ধ্যাচলকে ফিরে না আসা পর্যন্ত ওইভাবেই থাকতে বলে মুনি হাওয়া। সেই থেকেই ‘অগস্ত্যযাত্রা’ শুরু। অভিভাবকহীন বলে পাহাড়-পর্বতের ওপর পারিবেশিক উৎপাত চলে অবাধ, অবিরত। পর্বতমালার কথাই ধরা যাক। তাদের বাঁচানোর জন্য না আছে মাটির চাদর, না গাছপালার নিবিড় বাঁধন। ফলে নিরেট, অবিচল পাথরও বৃষ্টি, তুষারপাত আর বাতাসের গুঁতোয় ক্ষইতে থাকে। ফ্রস্ট বা তুষারের ভূমিকা অনেকখানি। কারণ পাহাড়ের ফাটলে বা ফুটো দিয়ে জল ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারপর জমে বরফ হলে জলকণা আয়তনে বেড়ে প্রবল চাপ দেয়, তাতেই পাথর ভেঙে খান খান। একবার ভেঙে যাওয়া পাথরকণা আর জোড়া লাগার উপায় নেই! ক্ষয়ে যাওয়া পাথরকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেয় মূলত জল, কিছুটা হিমবাহও। শুধু ভৌত (ফিজিক্যাল) ধাক্কাই নয় জলের রাসায়নিক ধাক্কাও আছে। কারণ অনেক সময় জলে অ্যাসিডও থাকে। পাহাড়-গায়ের মিহি কণা জলে গুলে মাটি হয়। অন্যদিকে কোয়ার্জ বড় কঠিন ঠাঁই। সহজে ভাগ হয় না। এটাই টুকরো টুকরো হয়ে পরিণত হয় বালিতে। বালির বেশিরভাগটাই সিলিকা। পাহাড়পথের পাশে পড়ে-থাকা গ্র্যানাইট পাথরের চাঁইয়ের নিচে গুঁড়ো গুঁড়ো পাথর দেখা যায়। তারই আশপাশে বহুকোণা বালিদানা। এটাই পাহাড় ভাঙার

ইতিকথা।

মাপ অনুযায়ী এদের দুটো নাম আছে। গ্র্যাভ্‌ল আর স্যান্ড। গ্র্যাভ্‌ল মানে কাঁকর বা নুড়ি, আর স্যান্ড নিখাদ বালি।

উপকূল বা নদীর বালি তার উৎপত্তি স্থলের কাছেই থাকে। তার মধ্যে নরম পদার্থও থাকে। পরে যা আলাদা হয়ে যায়। এই টুকরোগুলো, যুগ যুগ ধরে একে অপরের গায়ে ঢলাঢলি করতে করতে নদীর তলদেশে, হ্রদ বা সমুদ্রে এসে জমা হয়। আর পারস্পরিক গুঁতোগুঁতিতেই এদের এবড়ো-খেবড়ো বাইরেটা মসৃণ হয়ে ওঠে। বালি কাকে বলা যাবে, তার নির্দিষ্ট মাপ আছে। হতে হবে এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ থেকে একশো ভাগের এক ভাগের মধ্যে। এর চেয়ে মাপে বড়কে বালি বলে ডাকলে সে বলে উঠতে পারে, 'বালি বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।' সে তখন কাঁকড় বা নুড়ি। মরুভূমিতে তো জল নেই। সেখানে জলের কাজ করে বাতাস। আর বাতাস-লাঞ্ছিত, মানে বাতাসের কারণে ধাক্কাধাক্কিতে ক্ষয়ে যাওয়া বালি সাধারণত অনেক বেশি গোলগাল হয় জল-লাঞ্ছিত বালির চেয়ে। জল দুই বালিদানার ঘনিষ্ঠতায় কাবাব মেঁ হাড্ডি। ঘর্ষণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

পাহাড় ক্ষয়ে তৈরি মিহি দানার পাথরকণাকে নদী বিনা ক্লেশে বয়ে আনতে পারে। সমুদ্রে পড়েও প্রথম দিকে তারা জলে ভাসতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে থিতোয়। অন্যদিকে কোয়ার্জ কণা বড় এবং ভারী হওয়ার দরুন দ্রুত নিচে পড়ে যায়। এই জন্যই পাড়ে বালি দেখা যায়, কাদা অনেক দূরে। বালির মধ্যে থাকা কাদা জলে ধুয়ে যাওয়ার দরুন তার চেহারাটা হয় খোলতাই। পরিষ্কার, ঝকঝকে। হলুদ, লাল বা বাদামি— নানা রঙের বালি দেখা যায়। আমরা সাধারণত দেখি হলুদ-বাদামি। আয়রন অক্সাইড ঘাপটি মেরে থাকে বলে। লোহার জংয়ের মতো। অনেক সময় সোনা বা প্ল্যাটিনামের মতো মূল্যবান আকরিকও বালির সঙ্গে মিশে থাকে। সিলিকাসমৃদ্ধ খাঁটি বালি দুর্লভ। এ দিয়ে কাচ, মর্টার, ফিল্টার ইত্যাদি তৈরি হয়।

শুকনো বালিকে হাওয়া অনেক সময় তার ঘর থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। জমা করে দূরে কোথাও, দূরে দূরে। সেখানে তৈরি হয় ঢিবি। ইংরেজিতে 'ডিউনস'। তার ওপর কোনো গাছপালা গজিয়ে না উঠলে ডিউনস আবার হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে গিয়ে উদয় হয়।

বালুকাবেলা নিয়ে আমরা গান বাঁধি, অনেক সময় বালি নিজেও গান করে! অনেক তটভূমি থেকেই চিড় খাওয়ার মতো তীক্ষ্ণ শব্দ (ক্র্যাকিং সাউন্ড) শোনা যায়। মাউন্ট সিনাইয়ের 'সিংগিং স্যান্ডস' তো বিখ্যাত। আর আরবের জেবেল নকাস বা বেল মাউন্টেন থেকে প্রথমে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, পরে তা পরিণত হয় ঘোর গর্জনে। বেদুইনরা বিশ্বাস করে ব্যাপারটা ভূতুড়ে। খ্রিষ্টানদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া মঠ থেকেই নাকি আওয়াজটা আসে। সুরেলা বালিও আছে। ডরসেটের স্টাডল্যান্ডে বা কাজাখস্তানের ইলি নদীর উপত্যকায়। কেন বাঙ্ময় বালি? এ নিয়ে অনেক তত্ত্ব আছে। একটা বলছে, বাতাসের ধাক্কায় একটা স্তরের ওপর দিয়ে আরেক স্তর বালির ঘষটে যাওয়ার দরুনই এই শব্দের সৃষ্টি। একেবারে বেহালার তারের ওপর ছড় টানার মতো। ওদের মাপ ও আকার এক হলে আওয়াজটাও সুরেলা হয়। আরেক দল বিজ্ঞানীর মতে, বালির ফাঁক দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় বাতাসের কম্পনেই সুরের সৃষ্টি। বাতাসের সঙ্কোচন প্রসারণেই সুরের ওঠা-নামা। এ নিয়ে স্থির তড়িৎ তত্ত্বও আছে। কারণ যাই হোক, দেখা গেছে, বালির আর্দ্রতার ওপরেও তার সঙ্গীত নির্ভর করে। খুব শুকনো বা খুব ভিজে বালি নির্বাক, নিসুর। আর হাওয়া যত জোরে বইবে সুরের আলো গগন বেয়ে ততই ছুটবে।

হিটলার বাবা-মা যেমন চেপে ধরে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়। তেমনি চাপের চোটে বালিরাও কাছাকাছি আসে, ক্রমশ জমাট বাঁধে। আবার পাথর হয়। যেন উৎসে ফেরা। এই জমাট বাঁধার কাজে ঘটকালি করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, আয়রন অক্সাইড বা সিলিকার মতো খনিজ পদার্থ। বালি জমাট বাঁধলে তাকে বলে বেলেপাথর (স্যান্ড স্টোন)। এগুলো নানা রঙের হয়, কাঠিন্যেও তারতম্য থাকে। যে বালিতে সিলিকা বেশি তাই দিয়ে কাচ তৈরি হয়।

বালির বাঁধ কমজোরি, বড়ই অস্থায়ী। যা থেকে 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ/ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ', কথাটার উৎপত্তি। তাই বলে বালিকে দুর্বল ভাবা ঠিক হবে না। ২০ ইঞ্চি শুকনো বালির স্তর সাধারণ গুলিকে অনায়াসে রুখে দিতে পারে। বালির বস্তা যুদ্ধে প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। বহু থানার সামনে বালির বস্তার আড়ালে রক্ষীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই হল মোটামুটি বালি-কাহিনী।

উমা

উন্নয়নের ফাঁসে ধ্বংস হচ্ছে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি, আমরা নির্বিকার দর্শক!

ধ্রুবা দাশগুপ্ত

সম্প্রতি পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট একটি অন্তর্বর্তী রায় দিয়েছে। বহুজন পরিচিত এই মামলার মাধ্যমে গত বছর মহামান্য আদালতকে জানানো হয়েছিল যে, একটি পরিকল্পিত উড়ালপুল জলাভূমির উপর দিয়ে গেলে তা শহরের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। সেই মামলার শুনানিতেই উড়ালপুলের কাজে স্থগিতাদেশ দেন মহামান্য আদালত। নির্দেশ দেওয়া হয়, উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কোনো নির্মাণের কাজ যেন না করা হয়। এই ঘটনাটির গুরুত্ব যথাযথভাবে বুঝতে গেলে বিজ্ঞান, সমাজ, নীতিপরায়ণতা এবং মানবকল্যাণের বড় ছবিটা ধৈর্যের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা একান্তই জরুরি।

বিশ্বের ইতিহাসে পরিবেশ এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বড় মাপের চর্চা শুরু হয় ১৯৭২ সালে। কিন্তু বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক মূল্যায়ন হবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ২০০৫ সাল অবধি, যখন ‘মিলেনিয়াম ইকোসিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট’-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের নাম ছিল ‘ইকোসিস্টেমস অ্যান্ড হিউম্যান ওয়েল-বিয়িং’ অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র এবং মানবকল্যাণ, আর সারা বিশ্বের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই মূল্যায়ন থেকে আমরা প্রথম জানতে পারি যে, বিশ্বের যত বাস্তুতন্ত্র আছে, তাদের মধ্যে জলাভূমিকেই সবচেয়ে দ্রুত হারিয়েছি আমরা। এটা গত কয়েক হাজার বছরের কাহিনী, তবে বিজ্ঞানীদের মতে কেবল বিংশ শতাব্দীতেই শেষ ৫০ বছর বিশ্বের উন্নত দেশগুলির ৫০ শতাংশের বেশি জলাভূমি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে মানবসভ্যতারই কারণে। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে দুটি বড় কারণ হল, দ্রুত পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং জমির চরিত্র পরিবর্তন। যে ১৩০০-র বেশি বিজ্ঞানী বিশেষ করে জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র মুল্যায়ন করেছিলেন, তাঁদের সুপারিশ ছিল— জলাভূমির থেকে আমরা যদি সর্বাধিক উপকৃত হতে চাই, তবে তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার অবশ্যই প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক জলাভূমি চুক্তি রামসার কনভেনশন এই মূল্যায়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং তথ্যগতভাবে অনেক উপকৃত হয়েছিল। রামসার কনভেনশন নিষ্ঠার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মূল উপদেশ গ্রহণ করেছিল এবং স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদের নির্দেশ দিয়েছিল, যেন তারাও এই উপদেশ গ্রহণ করে। বলাই বাহুল্য, সেই সময়ে তাতে বিশেষ কেউ কর্ণপাত করে নি।

পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, শহরের জলাভূমি রক্ষা করার দায়িত্ব যদি কেবল স্থানীয় প্রশাসনের পরিবেশ দপ্তরে দেওয়া হয়, তবে তা কখনই সুষ্ঠুভাবে পালিত হতে পারে না। এর কারণ, জলাভূমি রক্ষার মূল সমস্যা আসে নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা রূপায়িত করতে গিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জনবহুল শহরের বিষয়ে একথা প্রযোজ্য এবং পরিবেশ ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তাল মিলিয়ে কাজ করার নজির প্রায় নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে কলকাতা শহর ছিল একটি উজ্জ্বল ব্যাতিক্রম, কারণ প্রশাসনিক প্রয়োজনে

পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, শহরের জলাভূমি রক্ষা করার দায়িত্ব যদি কেবল স্থানীয় প্রশাসনের পরিবেশ দপ্তরে দেওয়া হয়, তবে তা কখনই সুষ্ঠুভাবে পালিত হতে পারে না। এর কারণ, জলাভূমি রক্ষার মূল সমস্যা আসে নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা রূপায়িত করতে গিয়ে।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে শহরে ময়লা জলকে কম খরচে পরিশোধন করার একটি উৎকৃষ্ট উপায় বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের প্রয়োজন অনুযায়ী। ভারত সরকারের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি পেয়েছিল আমাদের পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে গেলে এই জলাভূমি 'ওয়েস্ট স্টেবিলাইজেশন পন্ড'–এর (ময়লা জল থিতিয়ে দেবার পুকুরের) কাজ করে। এর গুরুত্ব আমাদের মতন দেশে কতখানি, সে কথায় পরে আসছি। তার আগে এটাই মনে করিয়ে দিই যে, পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক সহযোগিতা পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ক্ষেত্রে আশানুরূপ হয় নি এবং পরিবেশ ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মধ্যে দূরত্ব আজও থেকে গিয়েছে। তাই আজ ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, যারা এই রামসার ক্ষেত্রটি দেখাশোনা করে, তারা অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সংরক্ষণের কাজে গ্রহণযোগ্য সাফল্য পায় নি। আজ বোধহয় তা দুয়োরানীর স্থানেও নেই!

জলাভূমি নিয়ে গবেষণা করেন এমন বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান সোসাইটি অভ ওয়েটল্যান্ড সায়েন্টিস্টস থেকে প্রকাশিত হয় তাদের জার্নাল 'ওয়েটল্যান্ডল'। এইবারের সংখ্যায় জলাভূমি এবং আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে একসঙ্গে হয়ে লিখছেন পৃথিবীর অগ্রণী গবেষকেরা।

তাঁদের লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিজ্ঞান যতই জোরালো হোক না কেন, দেশের প্রশাসকেরা যদি প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় এই বিজ্ঞানের শিক্ষাকে গ্রহণ না করেন, তাহলে সে দেশের জনসাধারণ বিজ্ঞানের দ্বারা কখনই উপকৃত হবেন না। আমাদের দেশে জাতীয় স্তরে কোনো জলাভূমি নীতি বা পলিসি নেই, যার মধ্যে দিয়ে জলাভূমি সংরক্ষণের প্রতি সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জলাভূমি সংরক্ষণের জাতীয় স্তরের নিয়মাবলী, সেন্ট্রাল ওয়েটল্যান্ড রুল্‌স, গত বছর পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাতে সংরক্ষণের দায় এবং দায়িত্ব অধিকাংশই রাজ্যস্তরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইন অমান্য করা হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কী হবে সেটা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার এবং প্রশাসকদের আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার আছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে নি।

রাজ্য স্তরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দুর্ভাগ্যজনক চেহারাটা ফুটে ওঠে। এই রাজ্যের সরকার কিন্তু বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ২০১২ সালে একটি রাজ্য জলাভূমি নীতি তৈরি করেছিল। ইন্টারনেটে খোঁজ করে দেখলে সেটা এখনও ড্রাফ্‌ট আকারে পাওয়া যাবে। দুঃখের বিষয় এই যে, এটা সুপারিশ আকারে সরকারের ঘরেই পড়ে আছে, বাস্তবায়িত করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। এই নীতি সারা রাজ্যের জন্য তো বটেই, বিশেষ করে শহরে অবস্থিত জলাভূমির জন্য যারপরনাই প্রয়োজনীয়।

আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে সংগঠিত হয়েছিল ICLEI-Local Government for Sustainability, তার প্রথম নাম

ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর লোকাল এনভায়রনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভস'। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারা আয়োজিত মহাসভাতে, যার নাম ছিল 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অভ লোকাল গভর্নমেন্ট ফর আ সাসটেইনেব্‌ল ফিউচার'। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর মাত্র দুই শতাংশ স্থান জুড়ে আছে শহর। ঘটনা হল শহরই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ৭৫ শতাংশ ব্যবহার করে ও ৭০ শতাংশ বর্জ্য নিষ্কাশন করে। এই প্রাকৃতিক সম্পদের একটা বড় অংশ জল, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সমস্ত ভাবেই জড়িত। তাই নগরোন্নয়নের যে কোনো দায়িত্বশীল পরিকল্পনায় জলভিত্তিক পরিকাঠামো বা ওয়াটার ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে যুক্ত করার একটা অবিচ্ছেদ্য জায়গা আছে। রামসারের নির্দেশ অনুযায়ী, জলাভূমিকে নগর পরিকল্পনায় আনা উচিত এই জলভিত্তিক পরিকাঠামো হিসেবে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল শহরের ময়লা জল পরিশোধন করা।

ফিরে আসি শহর-ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের আলোচনায়। মানুষ তার জীবনযাপনের চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের যে পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে তাকে মাপার একটা পদ্ধতি আছে, যা 'ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট' নামে পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন শহরের ফুটপ্রিন্ট মাপার কাজ নব্বইয়ের দশক থেকে চলছে। গবেষকেরা দেখেছেন, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরের জনবসতির যা চাহিদা, তা মেটাতে শহরের আয়তনের ২০০ গুণ ভৌগোলিক এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে হয়, তবেই এই শহরের মানুষ সেখানে বাস করতে পারেন।

লন্ডন শহরের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি ২৯৩ গুণ। যে দুজন বিজ্ঞানী এই ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্টের গণনা চালু করেছিলেন, তাঁরা সুপারিশ করেছেন যে, শহরের উৎপাদনশীলতা বাড়লেই তাদের ফুটপ্রিন্ট কমবে, এজন্য প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে মাছচাষ, সবজি উৎপাদন, বন সংরক্ষণ— যে যে উপায়ে প্রাকৃতিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব, সবই ভৌগোলিক এলাকার উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেবে।

জলাভূমিকে শহরের কার্যকর অংশ হিসেবে কি আমরা সত্যিই দেখতে পারি? ইতিহাস বলে, এটা সম্ভব। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্‌থ শহরে, যেখানে লেক ক্লেয়ারমন্ট নামে একটি জলাভূমি ঔপনিবেশিক আমল থেকে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ বিনাশের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। এই শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে প্রশাসনিক সদিচ্ছায় এই জলাভূমিটি এবং তার আশেপাশের প্রাকৃতিক সম্পদ পুনর্গঠিত হতে থাকে। বর্তমানে এটি এলাকার মানুষদের গর্বের কারণ। আমাদের ভারতের মতো জনবহুল দেশ চীন তার বিভিন্ন শহরের ক্ষতিগ্রস্ত জলাভূমিগুলিকে একের পর এক বাঁচিয়ে তোলার কাজে নেমেছে। এদের মধ্যে অন্যতম শহর হল বেজিং, নানজিং, ঝেনজিয়াং এবং হাংঝাউ। শহরের প্রশাসকেরা এইদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন এবং জলাভূমি পুনর্ব্যবহারের যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চলছে। দুবাইয়ের রাম-আল-খোর জলাভূমি, এলাকার মানুষদের প্রচেষ্টায় নতুন জীবন পেয়েছে।

জলাভূমির সঙ্গে বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এবং ময়লা জল পরিশোধনের জন্য জলাভূমির উপযোগিতা বিশেষজ্ঞরা মেনে নিয়েছেন। ময়লা জল পরিশুদ্ধ করে এমন জলাভূমিকে 'ওয়েস্ট স্ট্যাবিলাইজেশন পন্ড' নামে চিহ্নিত করে এই প্রযুক্তিকে কম খরচে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে অভিহিত করেছে কমপেন্ডিয়াম অভ স্যানিটেশন সিস্টেমস অ্যান্ড টেকনোলজিস। আমাদের দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম ঋণদাতা বিশ্ব ব্যাঙ্কও এই মর্মে অনেক তথ্য সরবরাহ করে।

আমাদের নদী গঙ্গার তীরে অবস্থিত বহু শহরের ময়লা জলের যান্ত্রিক পরিশোধন ব্যবস্থা কিন্তু ভেঙে পড়েছে, যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয় না। আর যে ব্যবস্থা মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের জন্য আজও টিকে আছে, তাকে আমরা উন্নয়নের নামে ধ্বংস করছি!

বিজ্ঞানের অবিমিশ্র বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। জলভিত্তিক পরিকাঠামো হিসেবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য, শহরের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এর নিরবচ্ছিন্ন অবদানের ফসল আমরা তুলে এসেছি গোটা বিংশ শতাব্দী ধরে, এখনও তুলছি।

যতদিন এই জলাভূমিকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারব ততদিন আমাদের ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট-এর গণনা নিঃসন্দেহে অন্য অনেক শহরের তুলনায় কম হবে। এই যে আমাদের কম খরচে বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের কাজ সম্পন্ন করেন ধাপার কুড়ুনিরা, তাঁরা, প্রয়াত ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের ভাষায়, পজিটিভ বা ইতিবাচক ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্টের বাহক। তাঁর ভাষায় এই জলাভূমি ছিল প্রকৃতির সঙ্গে সৃজনশীলভাবে বেঁচে থাকা বা লিভিং ক্রিয়েটিভলি উইথ নেচার-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিশ্বের সর্বচর্চিত বিজ্ঞানও বিভিন্নভাবে এই একই কথা বলছে। আক্ষেপ হয়, এই জলাভূমি বিশ্বজনবিদিত, তা সত্ত্বেও আমাদের বারবার আদালতের দ্বারস্থ হয়ে এ কথা প্রমাণ করতে হচ্ছে নিজেদেরই কাছে। আমাদের নিজেদের সহজাত বিচারবুদ্ধি দিয়ে, বিজ্ঞানমনস্কতা দিয়ে, শুভবুদ্ধি দিয়ে, জলাভূমি সমাজের মানুষের অসামান্য পরিচালন ব্যবস্থা এবং পরম্পরাগত জ্ঞানে আস্থা রাখতে আমরা চাইছি না কিছুতেই! এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে!

উমা

অগ্রগতি কি অবশ্যম্ভাবী

এটি বার্ট্রান্ড রাসেলের 'ইজ প্রগ্রেস অ্যাসিওর্ড' প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৯৩১ থেকে ৩৫–এর মধ্যে কোনো এক সময়ে। অনুবাদ করেছেন **ললিত খাঁড়া**

বিগত অর্ধশতকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অভাবনীয়ভাবে দ্রুত বিস্তারলাভ করেছে, কিন্তু তারই মধ্যে আদিম মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে রকম লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে, সে রকমটা খুব অল্প ক্ষেত্রেই ঘটেছে। যে সব ছোট্ট পড়ুয়া এখন ইতিহাস পড়া শুরু করছে, তাদেরকে এখন আদিম মানবজাতিগুলির ক্রমোন্নতির বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়। সেটা পূর্বতন গ্রিস, ইতালি বা ব্রিটেনের ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের শুষ্ক বিবরণের থেকে অনেক বেশি মনোগ্রাহী। The Long Road from Savagery to Civilisation by Fay-Cooper Cole (Baltimore: William & Wilkins, 1933) এই বই কাহিনীটি এমনভাবে বর্ণনা করেছে যে, যে কোনও বুদ্ধিমান পড়ুয়ার মনোযোগ ধরে রাখতে পারবে।

লিপি আবিষ্কারের আগের মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ ও পুরাতত্ত্ববিদেরা এত কিছু আবিষ্কার করেছেন, যা আজ থেকে ৫০ বছর আগেও সম্ভব বলে মনে হত না। মানুষ একটু একটু করে পাথরের হাতিয়ার, পশুদের গার্হস্থ্যকরণ, কৃষি, ব্রোঞ্জ ও লোহার ব্যবহারের মাধ্যমে তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে অন্যান্য শ্বাপদ পশুদের ভয়ে ভীত বিরল ও নগণ্য এক প্রজাতির পশু থেকে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব অর্জনকারী আজকের বৃহত্তর পশুদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য জীবে উত্তরিত হল।

মানুষের ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুস্থ ও উৎসাহব্যঞ্জক। এই ইতিহাস মানবজাতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে; দেশ, জাতি বা বর্ণ–বিভাজনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতস কাচের বিকৃত দৃষ্টিতে নয়। এই ইতিহাস পশ্চাদগতির চেয়ে অগ্রগতিরই প্রাধান্য দেখায় এবং নতুন কলা–কৌশলের মাধ্যমে সভ্যতার নতুন নতুন সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে। মানুষের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির দীর্ঘকালীন এই আশা তাই সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত ও বর্তমানে আমরা যে বিষাদময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে ভরসা জোগায়। ইতিপূর্বে আমি যে বইটির উল্লেখ করেছি লেখক সেটি শেষ করেছেন, 'We face the future with a confidence born of achievement.' (আমরা আমাদের অতীত কৃতিত্বের নিরিখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে পারি।) সুদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই আশাবাদ সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎ, ধরা যাক আগামী ২০০ বছর সম্বন্ধে কিন্তু ঐ কথা ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় না। যদি আপনি ৪০০ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের বাসিন্দা হতেন এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হতেন তবে আগামী ২০০ বছর ধরে ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সুউন্নত সভ্যতার ধারাবাহিক অস্তগামিতা দেখতে পেতেন, যা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরতে প্রায় ৮০০ বছর অপেক্ষা করতে হত।

তাছাড়া শুধু যে রোম সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটেছিল তা নয়। মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতারও একই ধরনের পরিণতি ঘটেছিল এবং মিনোয়ার সভ্যতা তো বর্বর জাতির আক্রমণে ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান সভ্যতা শুরুটা দারুণ করলেও পরবর্তীকালে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। চীন ও জাপানের সভ্যতাও শতাব্দীর পর শতাব্দী গৃহযুদ্ধের ফলে ব্যাহত হয়েছে। আজও পর্যন্ত নিকট প্রাচ্যের সভ্যতা তার ২০০০ বছর আগেকার সভ্যতার থেকে পিছিয়ে আছে। যে সব সভ্যতা বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয় নি তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পচনে নষ্ট হয়েছে।

পুরাকালে অনেক সভ্যতা তো ছিলই, তা ছাড়াও অনেক দেশ ও জাতি ছিল, যারা সভ্যতার আলো দেখে নি। কিন্তু এখন জগতের একীকরণ ঘটছে। ১৫০ বছর আগে উত্তর ইংল্যান্ডে যে যন্ত্রসভ্যতার জন্ম হয়েছিল, তা এখন পূর্বতন সমস্ত বৃহৎ জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের অর্থনৈতিক সম্পদকে সেই উদ্দেশে নিয়োজিত করেছে। এখন যদি এই সভ্যতায় পচন ধরে, তখন আর তাকে বাইরে থেকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে না। যদি এই সভ্যতা নিজেদের অন্তঃকলহ ও যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাকে

পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে কোনো নতুন জাতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটা আমাদের যুগের একটা নতুন বাস্তবতা। এর ফলে ইতিহাস থেকে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত টানা বেশ শঙ্কাজনক। তাই এই অগ্রগতিকে যদি অব্যাহত রাখতে হয়, তবে তাকে পূর্বতন সভ্যতার চেয়ে অনেক বেশি যত্ন সহকারে ও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিতে সুপরিকল্পিতভাবে এর সংরচনা করতে হবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন এতটাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর যে আমাদেরকে সেই পথেই এগোতে হবে। আমরা যদি আমাদের সমাজজীবনের অংশবিশেষের মধ্যে আদিম বর্বরতার স্থান করে দিই তবে তা সভ্যতার অন্য দিকগুলিকেও ধ্বংস করে সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস ডেকে আনবে।

অধুনা আমাদের বর্বর অতীত থেকে পাওয়া কিছু কিছু অযৌক্তিক প্রবণতাকে উচ্চাসনে বসানোর ঝোঁক দেখা দিয়েছে; কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। যাঁরা সেই প্রবণতার সমর্থক, তাঁদের উচিত শিল্পায়নের সুফলগুলি বর্জন করে তীরধনুকের যুগে ফিরে গিয়ে ৯০ শতাংশ মানুষকে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া। তাঁরা যদি এই বিকল্পের সম্মুখীন না হতে চান তবে তাঁদের উচিত হবে নিজেদের আদিম আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে সভ্য হওয়া। শুধু প্রাকৃতিক শক্তির ওপর প্রভুত্ব অর্জন করে তা হওয়ার নয়।

উমা

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

ফি বছর বর্ষা মানেই বন্যা। বন্যা নিয়ে এর আগে আমাদের দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বন্যা এখনও প্রাসঙ্গিক। তাই সমসময়কে ধরে উৎস মানুষ প্রকাশ করতে চলেছে নতুন সঙ্কলনগ্রন্থ।

প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র তবু তুচ্ছ নয়

আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য কেরল আজ বন্যায় ভাসছে। শুধু বন্যা নয়, বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষের চোখের জলেও মানুষ ভাসছে। বৃষ্টি কমেছে, বেড়েছে কেরলবাসীর চোখের জল। তিল তিল করে গড়ে তোলা ঘরসংসার এক ধাক্কায় তলিয়ে গেছে। চোখের সামনে ভেসে গেছে প্রিয়জন। এখন তারা কোথায় থাকবে, কী খাবে, জানে না। কেরলবাসীর দুঃখে সারা পৃথিবী তথা ভারতবাসীও দুঃখিত। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যই নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের বাংলাতেও সরকার ছাড়াও অনেক বেসরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন করে তার উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না।

আমি এখানে বলব, একেবারে ছোট মাপের একটি উদ্যোগের কথা। হাওড়া জেলার বালি–দুর্গাপুর অঞ্চলের একটি ছোট এলাকা সাহেববাগান। এই এলাকার কয়েকজন স্কুলছাত্র যাদের চোখ এখনও আকাশের দিকে, মন উধাও ঘুড়ির পেছনে, তারা কেরালার বন্যার খবর জানতে পেরে ঘুড়ির থেকে সরিয়ে মন দিয়েছে ত্রাণসংগ্রহে। খেলার সাথীদের জুটিয়ে দলবেঁধে কেরালার বন্ধুদের জন্য নিজেদের সাধ্যমতো জোগাড় করেছে জামাপ্যান্ট, মুড়িচিঁড়ে, ছাতু, বিস্কুট ইত্যাদি। ছোট এলাকায় নিজেদের পরিচিত মানুষজনদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহের যে প্রচেষ্টা তাকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

বাইরের জগতের খবরাখবরর এরা বিশেষ রাখে না। টিভির আকর্ষণীয় সিরিয়াল, খেলা ইত্যাদি ছেড়ে খবর দেখার ধৈর্যও বড়দের অনেকেরই থাকে না, আর এরা তো ছোট। তবুও এদের মধ্যে একজন–দুজন পাড়ার মোড়ে বসা বা দোকানে আসা বড়দের মুখে কেরালার বিপর্যয়ের আলোচনা শুনে বন্ধুদের মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। পড়ার ব্যাচে স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে কেরলের বিপর্যয়ের কথা। আর এক্ষেত্রে 'আমরা ছোটরা কীভাবে সাহায্য করব?' এসব কথা আলোচনা হচ্ছে শুনে তাদের শিক্ষক বলেন, ছোটরাও বড় কাজের অংশ হয়ে উঠতে পারে, তাদের কাজ দিয়ে। ব্যস! ওদের মনে জাগে নতুন উৎসাহ। দলবেঁধে নেমে পড়ে ত্রাণ সংগ্রহে। আর তা বড়দের সাহায্যে পাঠিয়েও দেয় যথাস্থানে। ত্রাণের জিনিসপত্র যদিও সামান্য, তবুও তা প্রশংসার দাবি রাখে। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের জন্য রইল লাখো সেলাম!

পূরবী ঘোষ

গ্রন্থ সমালোচনা

গতিময় গদ্যে নদীর কথা

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

হুগলি নদীর গতি ও প্রকৃতি ● তপোব্রত সান্যাল ● প্রকাশক মিরান্দা ● প্রকাশকাল ২০১৫ ● পৃষ্ঠা ১৬৫ ● মূল্য ২০০ টাকা

তপোব্রত সান্যাল ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর নদীবিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি একজন ভূপ্রযুক্তিবিদও। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান
হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। (বাংলা করলে দাঁড়ায়, জল ও অন্য তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রধান প্রযুক্তিবিদ।) কাজেই তপোব্রতবাবুর কাছ থেকে আমরা আশা করতেই পারি নদীর গতিসংক্রান্ত একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা এমন বই, যাতে নদী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। ঠিক এই কাজটাই তিনি করেছেন 'হুগলি নদীর গতি ও প্রকৃতি' বইতে।

১৬৫ পাতার এই বইটি বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর সঙ্গে তিনটে পরিশিষ্ট, পাদটীকা এবং তথ্যসূত্র ও সহায়কপাঠ আছে। অধ্যায়গুলি এইরকম: উপক্রম, পুরাকথা, হুগলি নদীর প্রবাহপথ, প্রবাহপথের ভূতত্ত্ব, প্রবাহ বৈশিষ্ট্য, মোহনায় স্রোতবৈচিত্র্য, পলি–সংবহন বৈচিত্র্য, ফরাক্কা
প্রসঙ্গ, নাব্যতা প্রসঙ্গ, ভাঙন প্রসঙ্গ, হুগলি নদীতে দূষণ এবং হুগলি নদীর ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ, একটা নদীর যে যে বিষয় জানা জরুরি, ঠিক সেই সেই বিষয় নিয়ে একেকটা অধ্যায়ে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

কোনো নদীর প্রবাহ নির্ভর করে সেই নদীর উৎস, প্রবাহপথের ভূ–তত্ত্বীয় বৈশিষ্ট্য, শাখা ও উপনদীর বৈশিষ্ট্য, অববাহিকার ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদির ওপর। হুগলি নদীর প্রবাহও উপরে কথিত কারণে পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। পশ্চিমবঙ্গের রাজমহলের কাছে গঙ্গা প্রবেশ করেছে। ফরাক্কার কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটা অংশ পূর্বদিকে 'পদ্মা' নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, আরেকটি অংশ দক্ষিণ দিকে 'ভাগীরথী' নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। নবদ্বীপের
বিপরীতে 'জলঙ্গী' নদীর মিলনের পর জোয়ার–প্রভাবিত অংশের বিদেশী বণিকদের দেওয়া নাম হয়েছে 'হুগলি'। তৃতীয় অধ্যায়ে তপোব্রতবাবু দুটো মানচিত্র দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা দেখছি ভ্যান ডেন ব্রুকের নকশা, কিন্তু অন্যটা কার সেটা উল্লেখ করলে ভাল হত। মেঘনাদ সাহার যে মানচিত্রের কথা মূল লেখায় উল্লেখ আছে (২৩ পৃষ্ঠা) এটা কি সেটা? প্রচুর মানচিত্র দিয়েছেন বইয়ের বিভিন্ন অংশে, হুগলি নদীর বিভিন্ন সময়কালের, যেটা নদীর প্রবাহের সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন বুঝতে সাহায্য করবে।

হুগলি নদীর প্রধান উপনদী দ্বারকা, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ ও হলদি ডানদিক থেকে মিলেছে। আর বাঁদিকে আছে দুটি শাখানদী জলঙ্গী ও চূর্ণী। এই নদীগুলি অনবরত তাদের গতি পরিবর্তন করেছে। জোয়ার–প্রভাবিত বলে হুগলি নদীর প্রবাহ–বৈশিষ্ট্য খুব জটিল। দিনে দুবার স্রোতের অভিমুখ বদল হয়। পাড়ের ভাঙন ও নদীর বাঁক নেবার প্রবণতা প্রবাহের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। এর ফলে নদীতে পলি জমে। আবার ঔপনিবেশিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে এই হুগলি নদীকে ঘিরে। উষ্ণায়ন এবং মানুষের নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর ফলে নদীর স্বাস্থ্যর ক্রমাবনতি হচ্ছে। অনেক সময় প্রয়োজনে নদীর গতিবেগকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরে নাব্যতা কমে যাবার ফলে পোত পরিবহনে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের জন্য পলি খনন খুব জরুরি এবং তার জন্য বিপুল টাকার প্রয়োজন।

এই ধরনের একটা বই বাংলা ভাষায় খুব বেশি আছে বলে আমার জানা নেই। পরিভাষা সংস্কৃত–ঘেঁষা বলে নদীর স্রোতের মতোই কিছু কিছু জায়গায় ধাক্কা খেতে হতে পারে। তবে নদীর মতোই এই বইয়ের একটা স্বাভাবিক গতি আছে, যা আপনাকে কখনোই পদ্মার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না বরং তার ছলাৎ–ছল ভাষায় নদী সম্পর্কে অনেক না জানা তথ্য পরিবেশন করবে।

উমা

সংগঠন সংবাদ

(১)

আমাদের নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ব্লকে বেশ কিছুদিন আগে দুটি বিষধর সাপে কাটার ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করানোর ফলে দুটি ক্ষেত্রেই যথাযথ চিকিৎসা পেয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সুস্থ হয়ে যায়। এখনও বিষধর সাপে কাটার ফলে হাসপাতালে যথাসময়ে না গিয়ে বা ওঝার শরণাপন্ন হয়ে মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসার ঘটনা প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায়। ফলে, উক্ত ঘটনা দুটি সকলের নজরে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

প্রথম ঘটনাটি বিরহী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর গ্রামের সজল সরকারের। বয়স আনুমানিক ৩৫ বৎসর। সাপে কাটে ১২ বছর বয়সে। জমির আলে সজল শাক কাটছিল। এমন সময়ে চন্দ্রবোড়া সাপ ডান পায়ের গোড়ালিতে কামড় বসায়। কামড় খেয়েই ব্যথা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সজল বাড়িতে ছুটে আসে। বাড়িতে শুনেই কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে ওর বাবা–মা ওকে মাইলদুয়েক দূরের ওঝার বাড়িতে নিয়ে যায়। প্রচলিত কথা আছে— যত বেশি লোকের কানে সাপে কাটার খবর যাবে ওঝার মন্ত্রে তত কম কাজ হবে। সে জন্যই পরামর্শ যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হয়। ওঝার বাড়িতে ঝাড়ফুঁক করে সজলকে বাড়ি নিয়ে আসে। কিন্তু ওঝার আশ্বাস অনুযায়ী জ্বালাযন্ত্রণা না কমে বাড়তেই থাকে। পুনরায় সন্তর্পণে ওঝার

কাছে নিয়ে যাবার সময় ছেলেদের নজরে পড়ে। ছেলেরা বিষধর সাপে কেটেছে জানতে পেরে জোর করে ওঝার কাছে আর যেতে না দিয়ে নিজেরাই কালবিলম্ব না করে বাবা–মাকে সঙ্গে করে জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে সজলকে নিয়ে আসে। ভ্যানরিক্সা করে আনার সময় কল্যাণীর কাছাকাছি রেল গেট ওদের চোখের সামনেই বন্ধ হয়ে যায়। রেলগেট প্রহরীকে বিষধর সাপেকাটা রোগীর কথা বলায় উনি ভ্যানরিক্সাটা সঙ্গে সঙ্গে পার করে দেন। নেহরু হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল।

দু দিন চিকিৎসার পর সজলকে কলকাতা পিজি হাসপাতালে পাঠানো হল। পিজিতে এক মাস ভর্তি থেকে ডায়ালিসিস নিতে হল। তারপর পিজির ইনডোর থেকে ছুটি হল, পিজির আউটডোরের তত্ত্বাবধানে তিন বছর চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। সজল এখন সুস্থ। ওর ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে, মেয়ে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

সজলের চিকিৎসায় পাড়ার ছেলেদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ওরা কিছুদিন আগে দেখেছে উৎসমানুষ পাঠচক্র ও হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস–কুসংস্কার বিরোধী কমিটির গণ সচেতনতামুখী মিছিল, যে মিছিলে তারস্বরে উচ্চারিত হয়েছে ওঝার কেরামতি কোনখানে, বিষহীন সাপ যেখানে;

সাপে কাটলে, কুকুরে কামড়ালে কী করবেন— হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।

(২)

দ্বিতীয় ঘটনাটি ৬ মে ২০০৭–এর। হরিণঘাটা ব্লকের মোল্লাবেরিয়া ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকালীপাড়ায় গোপাল বিশ্বাসের বাড়ি। তখন ওঁর বয়স ৪৯ বৎসর। পাটের জমির আলের আগাছা নিরুনি দিয়ে পরিষ্কার করছিলেন। এমন সময় বাঁ হাতের তর্জনীর গোড়ায় চন্দ্রবোড়া সাপের দংশন। চন্দ্রবোড়া সাপটা কামড়ে চলে যাচ্ছে দেখতে পান। মুহূর্তের জন্যও মাঠে দেরি না করে দ্রুত বাড়ি চলে আসেন। বাড়ি এসেই স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে জনা দুই সঙ্গী নিয়ে সোজা কল্যাণী নেহরু হাসপাতালে চলে আসেন। জ্বালাযন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা। এভিএস ইঞ্জেকশন দেওয়া শুরু হল। গোপালবাবু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। ১২ মে ২০০৭ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন।

গোপালবাবু সুস্থ হয়ে উঠে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন, ‘সাপে কাটার পর শুধু আমাদের পাড়ার সাপের প্রদর্শনীর কথাই মনে পড়ল। উৎসমানুষ প্রদর্শনীর বাইরে কিছুই ভাবতে পারিনি। এখনও লোকের কাছে বলি, উৎসমানুষ প্রদর্শনী যমের দুয়ার থেকে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।’

আমাদের উৎসমানুষ পাঠচক্র তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করছে, আর তাতে দু–একজন মানুষেরও উপকার হচ্ছে। তারা যুক্তি–অযুক্তি বুঝতে পারছেন। আমাদের কাছে এটাই বিরাট প্রাপ্তি।

নিরঞ্জন বিশ্বাস
সদস্য, উৎসমানুষ পাঠচক্র